ঝড়ের সংকেত

প্রবোধকুমার সান্যাল

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড্ পাবলিশিং কোং লিঃ
৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ৭

১

কালবৈশাখীর প্রবল ঝড়বৃষ্টির মধ্যে বাবাকে গাড়ী হইতে নামাইয়া লইবার জন্য আমি হাওড়া স্টেশনে গিয়া অপেক্ষা করিতেছিলাম। আমি বাবার একমাত্র পুত্র, ভবিষ্যৎ জমীদারীর নির্ভুল ও নিরঙ্কুশ স্বত্বাধিকারী, পিতৃ-বিয়োগের পর জমীদারীটা যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারিব—এই সুখকল্পনায় আমি প্রকাশ্যে চরিত্রবান ও পিতৃবাধ্য ছিলাম।

মনে করিয়াছিলাম—দূর হইতে পিতাকে দেখিয়া হাতের জ্বলন্ত সিগারেটটা ফেলিয়া দিব, কিন্তু তাহার আর প্রয়োজন রহিল না। যথাসময়ে পশ্চিমের গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু বাবা আসিলেন না। খানিকটা খোঁজ করিলাম; কিন্তু রূপনগরের জমীদার মহাশয় দ্বিতীয় শ্রেণী ভিন্ন ভ্রমণ করেন না ইহা জানিয়া আমি আর বেশী পরিশ্রম করিলাম না। ধীরে সুস্থে সমস্ত ট্রেনখানার মুখের উপরেই আর একটা নেভিকাট্ ধরাইয়া মনে করিলাম, কোথাও একখানা বেঞ্চে বসিয়া ঝড়বৃষ্টি না থামা পর্যন্ত কালবৈশাখীকে লইয়া একটুখানি কবিত্ব করা

ক্। আজ এক মাস যাবৎ বৈশাখের প্রচণ্ড রৌদ্রে ও রাত্রে নিদ্রাহীনতায় গলদ্‌ঘর্ম হইয়া উঠিয়াছিলাম, কল্পনা ছিল পিতা আসিলে আগামীকাল তাঁহার নিকট কয়েক শত টাকা শোষণ করিয়া দার্জিলিঙে গিয়া স্নো-ভিউ-তে থাকিব এবং সন্ধ্যার দিকে ম্যাল্-এ গিয়া বাঙালী মেয়েদের আধুনিক স্টাইলের সমালোচনা করিয়া বেড়াইব, কিন্তু পিতা জীবিত থাকিয়াই যখন আমার কল্পনা এইভাবে ব্যর্থ করিলেন, তখন তিনি মরিলে হয়ত তাঁহার তালপুকুরে আমার জল খাইবার ঘটিটাও ডুবিবে না।

একখানা লোহার বেঞ্চ একাকী আশ্রয় করিয়া বসিলাম। বেকার জীবন যাপন করিয়া শরীরে কিছু মেদ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার উপর গ্রীষ্মকাল এবং তাহার উপরেও ধনাঢ্য পিতার গরম, সমস্তটা মিলিয়া কিছুকাল হইতে হাঁসফাঁস করিতেছিলাম। এমন অবস্থায় এই অকাল বাদলের সজল হাওয়ায় বড়ই পুলকিত হইলাম। পকেটে কিছু টাকা ছিল, একআধ জন বন্ধু-বান্ধব সঙ্গে থাকিলে হাওড়া স্টেশনের ইহুদীর হোটেলে পদধূলি দিতাম।

ঝড়ে, বৃষ্টিতে, মেঘের গর্জনে, দিশাহারা যাত্রীদের উচ্চরোলে সমগ্র হাওড়া স্টেশনের চারিধার ওলোট-পালট হইতেছিল। বৃষ্টিধারার ঝালরের বাহিরে চারিদিক ধূসর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। ঠিক এমনি সময়ে আমার পিছন দিক হইতে যে নাটকীয়

ঘটনাটি ঘটিল, তাহা কালবৈশাখীর এই প্রবল বিপর্যয় ছাড়া আর কোনও অবস্থাতেই হয়ত সম্ভব হইত না।

উপন্যাস রচনা করা আমার পেশা নহে; কিন্তু যাহা ঘটিল, তাহা ঝড়ের মতো একটানে আমার আলস্যবিলাস জীবনকে মূল কেন্দ্র হইতে উৎপাটন করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়া দিল।

কবিত্ব করিবার জন্য সিগারেটটা টানিতে টানিতে নিমীলিত দৃষ্টিতে বসিয়াছিলাম। জটলা পাকাইয়া যাত্রীর আনাগোনার দিকে একটুও লক্ষ্য ছিল না। সহসা ভীড়ের ভিতর হইতে নারীকণ্ঠের প্রশ্ন শুনিয়া সচকিত হইয়া চাহিলাম।

নমস্কার। চিনতে পারেন?

বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া এক তরুণীর দিকে মুখ তুলিলাম। আমার মাতাঠাকুরাণী আমাকে সতর্ক করিয়া বলিয়া থাকেন, আইবুড়ো ছেলে একা-একা থাকিলে প্রেতিনী আসিয়া গ্রেপ্তার করে। সেই কথা সহসা মনে পড়িয়া একটু সজাগ ও সোজা হইয়া বসিলাম। বলিলাম, কে আপনি?

ওমা চিনতে পারলেন না? আমি সরোজিনী দেবীর মেয়ে, মৃন্ময়ী।—বলিয়া আধুনিক সজ্জায় সুসজ্জিতা সুন্দরী প্রেতিনীটি হাসিমুখে আমার দিকে চাহিল।

বলিলাম, সরোজিনী দেবী কে?

বেশ যা হোক, এই ক' বছরেই সব ভুলে গেলেন? অবশ্য

আপনি তখন ছেলেমানুষই ছিলেন, চোদ্দ পনেরো বছরের বেশি নয়। আপনার নাম ত' রাজেন্দ্র?

মানলুম।

প্রেতিনী কহিল, আপনার বাবার নাম ব্রজেনবাবু ত'?

বলিলাম, মিথ্যে নয়।

আপনার মায়ের নাম সুরসুন্দরী কিনা?

লোকে তাই জানে।

সে কহিল, এত বললুম, তবুও আমাকে চিনতে পারলেন না? আপনি ছোটবেলা কা'র গলা ধরাধরি ক'রে 'শিবের গাজন' গাইতেন?

সবিস্ময়ে তাহার মুখের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলাম। সে পুনরায় কহিল, মনে নেই আপনার মায়ের আদেশে আপনার বাবা আমাদের ঘর জ্বালিয়ে উৎখাত করেছিলেন?

চুপ করিয়া রহিলাম।

মৃন্ময়ী হাসিমুখে আবার বলিল, সেই আমার বিধবা মা, যার ঘরে তু'বেলা আপনার জলযোগের বরাদ্দ ছিল।

আমার ভিতরের জমীদার এইবার কথা কহিল। বলিলাম, হ্যাঁ, এইবার সবই একটু একটু মনে পড়েছে। ঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল কেন, সে কথাটা কি ভেবে দেখেছ?

হ্যাঁ, আমার মায়ের নামে কলঙ্ক রটেছিল।

শুধুই কি রটনা ? নিজের কণ্ঠে আমি ইচ্ছা করিয়াই কিছু বিদ্রূপ মিশাইয়া দিলাম।

মৃন্ময়ী বলিল, না, বয়স হবার পর জানতে পেরেছি কিছু সত্য ছিল। যাক্‌গে, এতকাল পরে আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, খুবই আনন্দের কথা।

ছোটবেলা বাবা আমাকে বাইবেল হইতে দশ আজ্ঞা মুখস্থ করাইয়াছিলেন। যতদূর স্মরণ করিতে পারি, তাহার ভিতর শতকরা নব্বই ভাগ পালন করিয়াছি, উহাদের মধ্যে 'ব্যভিচার' শব্দটার অর্থ বুঝিতাম না বলিয়া গোপনে দিদিমাকে অনেকবার প্রশ্ন করিয়াছি, তিনি বলিতেন, বড় হইলে বুঝাইয়া দিব। বয়স হইবার পূর্বে দিদিমা মরিয়া গেলেন, সুতরাং ব্যভিচার বুঝিতে পারিলাম না। আজও মৃন্ময়ীর সহিত আলাপ করিতে গিয়া একটু উৎসুক হইয়া ভাবিলাম, আর যাহাই হউক, ইহার সহিত কথাবার্তা কহিলে ব্যভিচার হইবে না। মেয়েটা যে প্রেতিনী নহে, বরং পর্যাপ্তযৌবনা পূর্বপরিচিত এক তরুণী, ইহাতে আর সন্দেহ রহিল না। বলিলাম, সত্যই অনেককাল পরে দেখা, আমিও খুশী হলুম। তুমি যাই বলো, বাবার কিছু দোষ নেই, দোষ হচ্ছে সেই বেটা ওয়ারেন্ হেস্টিংসের, যার আমল থেকে জমীদারীর আরম্ভ। এখন থাকো কোথায় তোমরা ?

মৃন্ময়ী বলিল, কলুটোলায়।

এত ঝড়বৃষ্টিতে কি যেতে পারবে ? একা বেরিয়েছ কেন এই দুর্যোগে ?

মৃন্ময়ী চুপ করিয়া যখন রেলপথের দিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল, আমি সেই সুযোগে তাহার দিকে একবার চাহিলাম। আমার চেয়ে বছর চারেকের ছোট ছিল মনে পড়িতেছে। দরিদ্রের ঘরের মেয়ে বলিয়া স্বাস্থ্য ছিল বলিষ্ঠ ও নিটোল। সেই বয়সেই ইহার গলা ধরিয়া 'শিবের গাজন' গাহিতে দেখিয়া মা রুষ্ট হইতেন, অর্থাৎ ইহাই ভয় ছিল, পাছে ইহার উদীয়মান কৈশোরের ঘন গন্ধে আমার কিশোর মনে কোনো নেশা লাগে। ইহার আজিকার আকস্মিক আবির্ভাবে সেই অতীত ইতিহাসের পুরাতন পথ বাহিয়া পুনরায় সেই বিচিত্র গন্ধটা কেমন করিয়া যেন মুহূর্তের জন্য আঘ্রাণ করিলাম। কিন্তু আমি যে জমীদার, ইহা ভুলিলে আমার চলিবে না, আমার আভিজাত্যের অহংকারে ইহাও অনস্বীকার্য, এবং নারীর সান্নিধ্যলাভের জন্যও যে আমার আগ্রহ রহিয়াছে, তাহাই বা অস্বীকার করিব কেমন করিয়া ?

বলিলাম, বেঞ্চে জায়গা আছে, একটু বসতে পারো। এত বৃষ্টিতে যাওয়া সম্ভব নয়। একটু ধরুক।

মৃন্ময়ী করুণ হাসিমুখে বলিল, জমীদারের পাশে প্রজা কি একাসনে বসতে সাহস পায় ?

সে কথা ঠিকই বলেছ। পৈতৃক আদর্শ আমিও খুব মেনে

চলি। কিন্তু কলকাতা শহরটা বড়ই আজগুবী। এখানে শ্রীলাল চামারের বাড়ীতে ভাটপাড়ার ব্রাহ্মণেরা ভাড়া থাকে। ভয় নেই, বসো এখানে। একটু ফাঁক রাখো, তাহ'লেই হবে।

ফাঁক রাখিয়া আমার পাশে সে বসিল বটে, কিন্তু তাহাকে উস্‌খুস করিতে দেখিয়া মনে মনে একটু কুপিত হইলাম। ধনীর পুত্র বলিয়া আমার ভিতরে এমনি একটা আত্মাভিমান ছিল যে, আমার অনুরোধকে আদেশ বলিয়া কেহ মান্য না করিলে আমার খুন চাপিয়া যাইত। কিন্তু দেখিয়া মনে হইল—ইহাকে সে কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া বৃথা। আজ সে হাতের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে; সুতরাং সে মান রাখিতে না চাহিলে, জোর করা চলিবে না। এদিকে আবার এক তরুণী পাশে বসিয়াছে অনুভব করিয়া পুলক-শিহরণও কিছু লাগিয়াছে বৈকি! বিবাদ বাধাইয়া, তর্ক তুলিয়া এমন একটি সন্ধ্যাকে ব্যর্থ করিতেও আমার মন উঠিল না।

সাহস করিয়া বলিলাম, আচ্ছা, তোমার ডাক-নাম ছিল বোধ হয় মীনু, নয়?

মনে আছে দেখছি আপনার!

মনে তুমিই করিয়ে দিয়েছ। একটা স্মৃতির টানে আর একটা এসে হাজির হয়। তোমার সঙ্গে কেউ নেই কেন বলো ত'?

কেউ থাকলে কি আপনি খুশী হতেন?—এই বলিয়া সে পুনরায় হাসিমুখে আমার দিকে তাকাইল। তাহার হাসির ভিতরে আমি সেই চিরকালিনীর ছলনা দেখিতে পাইলাম না; হয়ত ভুল করিয়াই আমার মনে হইয়া গেল, অনেকক্ষণ হইতে একটা ব্যথার কাহিনী সে যেন কেবলই চাপিয়া যাইতেছে। তাহার চঞ্চল ও উদ্‌ভ্রান্ত চক্ষু আমার ভিতরেও যেন অস্বস্তি আনিতেছিল। আমি কেবল একবার পথের দিকে তাকাইয়া বলিলাম, কোনো ইঙ্গিত আমি করিনি মৃন্ময়ী, কেবল বলছিলুম, ভয়ানক তুর্যোগ, তুমি যেতে পারবে না।

কণ্ঠস্বর আমার করুণায় বিগলিত হয় নাই, ইহা যে আমার ভবিষ্যৎ প্রণয়কাণ্ডের একটা আভাস—এমন একটা উদ্ভট কল্পনাকেও আমি মনে মনে প্রশ্রয় দিতেছি না, কিন্তু এই তুর্যোগে একজন তরুণীর একাকিত্বের প্রতি একটা বিবেচনা ও কর্তব্যবোধ ছিল। আমার সচেতন আভিজাত্য কলঙ্কবতী সরোজিনীর কন্যার প্রতি অবশ্যই বিতৃষ্ণ; কিন্তু যে-মীনু আমার গলা ধরিয়া শিবের গাজন গাহিত, তাহাকে বাদলের বন্যায় নিষ্করুণভাবে ঠেলিয়া দিতে আমার মন উঠিল না।

প্লাটফরম হইতে লোকজন একে একে চলিয়া গেল, বৃষ্টির ঝর-ঝর ধারা অবিশ্রান্ত ঝরিতেছিল, এবং সেই নির্জনে আমরা তুইজন বসিয়া রহিলাম।

এক সময়ে সহসা সে উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, আচ্ছা, আপনি বসুন, আমি এবার এগোই।

বিস্মিত হইয়া বলিলাম, কী বলছ তুমি? আর কিছু না হোক, কাপড় চোপড় ভিজে গেলেও যে বিপদে পড়বে?

উপায় নেই রাজেনবাবু, আমাকে ফিরতেই হবে তাড়াতাড়ি। আচ্ছা, নমস্কার।—এই বলিয়া সটান পিছন ফিরিয়া, একটুও অন্তরঙ্গতার চিহ্ন না রাখিয়া, দ্রুতপদে তাহার হিল্-তোলা জুতার খটখট আওয়াজ তুলিয়া সে চলিয়া গেল। পুরাতন পরিচয়ের কোনো মূল্যই দিয়া গেল না। প্লাটফরম ছাড়াইয়া স্টেশনের বাহিরের দিকে অদৃশ্য হইয়া গেল।

সেই রাত্রি, বৃষ্টি ও মেঘগর্জন, ঝাপসা আলো, ইতস্তত ধাবমান যাত্রীর দল,—সমস্তটা মিলিয়া মনে হইল, ইহা যেন ক্ষণকালের একটা স্বপ্ন। ইহার জন্য কালবৈশাখীকেই দায়ী করিলাম। এমন ঘটনা ঘটে জীবনে। ঝড় উঠিয়া সব কিছুকে স্থানচ্যুত করে, অদ্ভুতের অবতারণা ঘটে। স্বভাবের সঙ্গে সঙ্গতি থাকে না, চরিত্রের সঙ্গে তাল মিলাইয়া চলে না। দম্‌কা বাতাস উঠিল, অতীতকালকে টানিয়া আনিয়া বর্তমানের উপর নিক্ষেপ করিল, আমার ভাবনার ধারাকে নূতন খাতে প্রবাহিত করিল। ফল এই হইল যে, নূতন করিয়া আর সিগারেট ধরাইবার উৎসাহ পাইলাম না, বরং সমস্ত পথটা ধীরে ধীরে

বৃষ্টিতে ভিজিয়া বাড়ী ফিরিবার জন্য এক সময়ে গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। কেমন একটা ক্লান্তি ও বৈরাগ্য আসিয়া ঘিরিল।

স্টেশনের বাহিরে আসিয়া পা বাড়াইতেই পুনরায় মৃন্ময়ীকে দেখিয়া আমি সচকিত হইলাম। যাহা বলিয়াছিলাম তাহাই হইয়াছে, অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে কাপড় চোপড় ভিজাইয়া সে বিপন্ন হইতে চাহে নাই। কাছে আসিয়া বলিলাম, যেতে পারোনি ত' ?

মনে হইল, আমাকে দেখিয়া সে আর খুশী হয় নাই। দেখিলাম—মৌখিক সৌজন্য প্রকাশ করিবার মতো বর্তমান অবস্থা তাহার নহে। সে কেবল বলিল, ভারি বিপদে পড়লুম।

বলিলাম, যদি তোমার আপত্তি না থাকে তাহ'লে আমার গাড়ীতে তোমাকে পৌঁছে দিতে পারি।

এই কথাটা শুনিবার জন্য সে যে এমন করিয়া প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা জানিতাম না। তাহার সমস্ত গাম্ভীর্য যেন সহসা চুরমার হইয়া গেল। ব্যাকুল হইয়া সে বলিল, মান অপমানের প্রশ্ন এখন আমার নেই, আমার বড়ই বিপদ্। আমাকে দয়া ক'রে শীঘ্র পৌঁছে দিন্।

তৎক্ষণাৎ ট্যাক্সি ডাকিলাম। সে উঠিয়া বসিল, আমিও উঠিয়া তাহার পাশে বসিলাম। ড্রাইভারকে নির্দেশ করিলাম, কলুটোলা।

বৃষ্টির ভিতর মোটর যখন ছুটিয়া চলিল, আমি তাহাকে প্রশ্ন করিলাম, ব্যাপারটা কি বলো দেখি? তোমার মা কোথায়?

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সে কহিল, তাঁকে নিয়েই ত' সব বিপদ্!

তাহার কণ্ঠস্বরে আমার সন্দেহ হইল। পুনরায় প্রশ্ন করিলাম, বিপদ্‌টা কি শুনি?

শুনলে প্রতিকার করতে পারবেন না, রাজেনবাবু। মা আমার মৃত্যুশয্যায়।—এই বলিয়া মৃন্ময়ী হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিল।

মৃত্যুশয্যায়! কী বল্‌ছ? তাঁকে ফেলে তবে তুমি বেরিয়েছ কেন?

অশ্রুজড়িত কণ্ঠে মৃন্ময়ী বলিল, এই গাড়ীতে যাঁর আসবার কথা ছিল, তিনি মায়ের পরম শত্রু। কিন্তু সে পাষণ্ড এলো না। আমি কি করি বলুন ত'?

পিতার অপেক্ষাও কৃপণ বলিয়া বন্ধুসমাজে আমার একটা দুর্নাম ছিল। যেখানে স্বার্থ ও লোভের খাদ্য নাই, সেখানে অর্থব্যয় করা আমার প্রকৃতিবিরুদ্ধ! কিন্তু সহসা গাড়ীর ভিতর বসিয়া অশ্রুমুখী মৃন্ময়ীর প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিয়া বলিয়া ফেলিলাম, তোমার কি টাকাকড়ির দরকার আছে?

তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া পুনরায় বলিলাম,

যাকে পরম শত্রু আর পাষণ্ড ব'লে অভিহিত করছ, তার জন্যে তোমাদের এই ব্যাকুলতা কেন, মৃন্ময়ী ?

বড়বাজারের ভিতর দিয়া গাড়ী চলিতেছিল, বৃষ্টির ছাট্ বাঁচাইয়া আমরা দুই জনে গাড়ীর গদির মাঝামাঝি বসিয়াছিলাম। মৃন্ময়ী মুখ তুলিয়া বলিল, আপনার কাছে কিছু প্রকাশ করা আমার পক্ষে শোভন হবে না ; তবে এইটি ব'লে রাখি, যেদিন আমাদের ঘর জ্বালানো হয়েছিল, সেদিন আমাদের যে অসহায় অবস্থা ছিল, আজো তেমনি আছে।

কেমন যেন আঘাত পাইয়া চুপ করিয়া রহিলাম। কিন্তু দরিদ্রের বেদনার ইতিহাস শুনিয়া অথবা বঞ্চিতের অশ্রু দেখিয়া মমতায় বিগলিত হইব, কিম্বা তাহার জন্য স্বার্থত্যাগ করিব, প্রাণ দিব, নিজের ভবিষ্যৎ জীবনতরী ডুবাইব—এমন ভাবালুতা আমার নাই। নিজের সহিত কতখানি সংগ্রাম করিয়া যে একটু আগে তাহাকে টাকা দিব বলিয়া একটি বেপরোয়া প্রতিশ্রুতি দিলাম, এবং তাহার জন্য মনে মনে যে এখনি অনুশোচনা আসিয়াছে, তাহা বুঝাইবার জন্য বৃহৎ মনস্তত্ত্বের শাস্ত্র আওড়াইবার প্রয়োজন নাই, ভুক্তভোগী মাত্রেই তাহা বুঝিয়া লইবেন। বাল্যপরিচয়ের কথাটা তুলিয়া মেয়েটা আমাকে একটু দমাইয়া দিয়াছে, কেমন একটা অযৌক্তিক আত্মসম্মানের প্রশ্ন আসিয়া পড়িয়াছে, নচেৎ বিপন্ন যুবতীকে

টাকার লোভে ভুলাইয়া এতক্ষণ আমি অন্য পথ ধরিতাম। আমার পরম গুরু পিতার নৈতিক বিচারের প্রতি ইহার বারম্বার কটাক্ষ আমার পক্ষে সহ্য করা কঠিন, ইহা তাহাকে জানাইয়া দিবার বাসনা হইল ; তাহার মৃত্যুশয্যাশায়িনী জননীর প্রতি আমার যে একটুও দরদ নাই, ইহাও জানাইয়া দিবার ইচ্ছা করিতেছিল। পৃথিবীর লোক মনে করিবে, আমি মনুষ্যত্ব প্রকাশ করিতেছি, বোকা জনসাধারণ সন্দেহ করিবে, আমি একটি বিপন্ন তরুণীকে উদ্ধার করিবার জন্য মোটর ভাড়া করিয়া ছুটিয়াছি, আমি দয়ার অবতার,—তাহাদের সন্দেহ ভঞ্জনার্থ আমি গাড়ীর ভিতর বসিয়া এখনই আমার পাশবিক স্বরূপ সহজেই প্রকাশ করিয়া দিতে পারি এবং তাহার জন্য কোনরূপ বিপদ্ ঘটিলে বড়লোকের ছেলে বলিয়া অনায়াসেই পরিত্রাণ পাইব, কিন্তু একটা কুৎসিত বৈষ্ণবী-দয়া আসিয়া আমার অকৃত্রিম পৌরুষকে আচ্ছন্ন করিল। মুখে কেবল বলিলাম, তোমাকে পৌঁছে দিয়েই আমি চ'লে যাবো, কেমন ?

মৃন্ময়ী বলিল, তাই যাবেন, আপনার বড় কষ্ট হোলো।

কলুটোলার এক গলির মোড়ে আসিয়া মোটর দাঁড়াইল। সে তাড়াতাড়ি নামিয়া একটা মৌখিক ধন্যবাদ না দিয়াই যখন পলাইবার চেষ্টা করিল, তখন আমি হঠাৎ সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিলাম। কলিকাতা রাজধানীর একটি বিশেষ খ্যাতি আছে,

এখানকার নরনারী বিচিত্র। মনে করিলাম, সমস্তটাই হয়ত প্রবঞ্চনা, হয়ত আমাকেই ভুলাইয়া একটি তরুণী এই বৃষ্টি-বাদলের দিনে গাড়ী চড়িয়া আসিয়া বাড়ী ঢুকিল। হয়ত ইহার অধিক দূর অগ্রসর হইলে আমাকে 'ব্ল্যাক্‌মেল' করিয়া টাকা পয়সা ছিনাইয়া লইবে। সংসারে কিছুই অসম্ভব নয়।

কিন্তু 'ব্ল্যাক্‌মেলের' ভয় করিব বড়লোকের ছেলে হইয়া? অভিজাত বংশের ছেলের নামে যদি একটু নিন্দাই না রটিল, তবে বাঁচিয়া থাকাই বৃথা। হয়ত ধন্যবাদ না দিয়া পলাইবার সঙ্কেত এই যে, আমি তাহাকে অনুসরণ করিব। এক মুহূর্তও বিলম্ব করিলাম না, ট্যাক্‌সিকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া গাড়ী হইতে বৃষ্টি মাথায় করিয়া নামিয়া আমি দ্রুতপদে মৃন্ময়ীর অনুসরণ করিলাম। একটা দুর্দান্ত খেলায় আমি মাতিয়া উঠিলাম। এমন একটা লোভের উপকরণকে কিছুতেই হাতছাড়া হইতে দিব না।

দরজার কাছে আসিয়া তাহাকে ধরিলাম। মৃন্ময়ী বিস্মিত হইল না, কেবল বলিল, আসুন আমার সঙ্গে সাবধানে, নীচেটা বড় অন্ধকার।

একবার গা ছম ছম করিয়া উঠিল। নিঃশ্বাসের দ্রুততা চাপিয়া সন্তর্পণে উপরে উঠিতে উঠিতে বলিলাম, শহরের এদিকটায় অনেক গুণ্ডার আড্ডা, এখানে থাকতে তোমাদের ভয় করে না, মৃন্ময়ী?

ভয়টা গরীবের জন্যে নয়, রাজেনবাবু।

তাহার কথায় আমার মুখখানা যেন ভোঁতা হইয়া গেল। কিন্তু কি করিব, অভিজ্ঞতা আহরণ করিতে আসিয়াছি, মান-অপমানের প্রশ্ন তুলিলে এখন চলিবে না। আমি তাহার পিছনে পিছনে উঠিয়া উপরে আসিলাম।

প্রকাণ্ড বাড়ীর উপর তলাকার একটি ক্ষুদ্র অংশ। পাড়া, পল্লী, চেনাপরিচয় কোথাও কিছু নাই, এতটুকু অবকাশ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না···চারিদিক যেমন জমাট তেমনি নিরেট্। দালানের দরজাটা একবার বন্ধ করিয়া দিলে পৃথিবীর সহিত আর কোন সম্পর্ক থাকে না। কেহ মরুক, কেহ খুন হউক, আত্ম-হত্যা করুক, কেহ জানিবে না। কোথায় একটা ছাপাখানা হইতে ফ্লাট্ মেশিনের একঘেয়ে শব্দ কানে আসিতে লাগিল। আমি একবার মুহূর্তের জন্য অসীম সাহস লইয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলাম। আমার জামায় সোনার বোতাম, হাতে সোনার হাতঘড়ি, পকেটে মনিব্যাগ, এবং আমার পৈতৃক প্রাণটা··· এই চারিটি বস্তু একত্র এক নিমেষের জন্য অনুভব করিয়া লইলাম, তারপর ঢোক গিলিয়া প্রশ্ন করিলাম, কোথায় তোমার মা, মৃন্ময়ী ?

এই যে, এই ঘর···বলিয়া মৃন্ময়ী আমাকে লইয়া একটি ঘরে ঢুকিল।

অবশ্য সমস্তই সত্য। রোগীর মৃত্যুশয্যা সাজাইয়া আমাকে

প্রতারিত করিবার ফন্দি নাই। বাল্যকালে যে 'মাসীমার' ঘরে বসিয়া জলযোগ সম্পন্ন করিতাম, তাঁহাকে অবশ্য চিনিতে পারিলাম না। প্রথমত, কালের ব্যবধান; দ্বিতীয়ত, চেহারাটা বিকৃত, রোগশীর্ণ। মৃত্যুর ছায়া ঘনাইয়াছে। আর বেশি দেরি নাই। সংজ্ঞার চিহ্ন দেখিলাম না, কেবল নিশ্চল অনড় একটি কঙ্কাল পড়িয়া আছে, কণ্ঠের মূল কেবল মাঝে মাঝে কাঁপিতেছিল। রোগের ইতিহাস শুনিবার প্রবৃত্তি হইল না, সহানুভূতি জানাইবার উৎসাহ আসিল না, কেবল চুপ করিয়া রহিলাম। সহসা মনে হইল, মৃন্ময়ী পিছন ফিরিয়া কাহাকে কী যেন ইসারা করিতেছে। তড়িৎগতিতে ফিরিয়া আমি প্রস্তুত হইলাম, পুনরায় আমাকে সন্দেহে ঘিরিল। চাহিয়া দেখিলাম, ঘরের একান্তে দুইটি যুবক এতক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়াছিল, লণ্ঠনের স্তিমিত আলোয় আগে তাহাদের লক্ষ্য করি নাই।

মৃন্ময়ী বলিল, কিছু আছে, মনে হোলো?

না।

আবার সে কাঁদিয়া ফেলিল, বলিল, ডাক্তার দেখাবার অবস্থা আর নেই জানি, হয়ত আর একআধ ঘণ্টা। কিন্তু আপনি এই উপকারটুকু ক'রে যান। সুধু হাতে টাকা আমি কোথাও পাবো না, এই চুড়ি দু'গাছা বিক্রি ক'রে আমাকে কিছু টাকা এনে দিন্।

যুবক দুইটিকে দেখিয়া আমার মন ঘৃণায় ভরিয়া গিয়াছিল। চুড়ি দু'গাছা তাহার হাত হইতে লইয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলাম, সোনার চুড়ি ত' ঠিক?

হ্যাঁ, সোনারই।

আচ্ছা চললুম, বোধ হয় পারবো আনতে। বলিয়া একবার বাহিরে পা বাড়াইলাম, এবং সেখান হইতেই পুনরায় ডাকিলাম, একটু এসো আমার সঙ্গে, কথা আছে।

গোপন প্রশ্ন করিবার সময় ইহা নহে, মৃত্যুপথযাত্রীর পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিচার করিবার অবসর ইহা নয়; কিন্তু স্বার্থ ও নিষ্ঠুরতা আমার সহজাত, একথা আমার ভুলিলে চলিবে না। আমার শীকার অন্যে হস্তগত করিবে, ইহার ভিতরে আমি যেমন আমার অক্ষমতার দৈন্য দেখিলাম, অন্যদিকে তেমনি আমার প্রতিহিংসার বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। মানুষের জন্ম হইলেই মৃত্যু হয়, তাহার জন্য দুঃখ করিয়া লাভ নাই; কিন্তু মৃত্যুশয্যা দেখিয়া উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া আমি আমার কড়া ও গণ্ডা ত' ছাড়িতে পারি না।

মৃন্ময়ী অন্ধকারে আমার সহিত মাঝপথে নামিয়া আসিল। আমি চুপি চুপি বলিলাম, ঢাকাঢাকি আমার কাছে নেই মীনু, একটা কথা আমাকে সত্য ক'রে বলো।

কি বলুন?

মনের আক্রোশ চাপিয়া সংযত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম,

তোমাদের কেউ নেই বলেছিলে, তবে ওই ষণ্ডামার্কা ছোক্‌রা দু'জন কে ?

ওদের ওপর রাগ হোলো কেন আপনার ?

রাগ হয় নি মৃন্ময়ী, ঘৃণা হয়েছে তোমাদের সকলের ওপর।

মৃন্ময়ীর মুখ অন্ধকারে দেখিতে পাইলাম না। কিন্তু সে করুণ কণ্ঠে কহিল, এখন আমার বড় অসময় রাজেনবাবু, আমার ওপর অবিচার করবেন না।

কঠিন নির্দয় কণ্ঠে বলিলাম, ওদের সঙ্গে তোমার সম্পর্কটা জানলে তবেই আমি নিজের ইতিকর্তব্যটা ভাবতে পারবো।

ওরা আমার কেউ নয়, ওরা পথের লোক।

তবে কে ওরা ?

পরিচয় পরে আপনাকে জানাবো। আমাকে ক্ষমা করুন, সেটা খুবই গোপনীয়।

গোপনীয়! তীব্রকণ্ঠে বলিলাম, না, এখনি তোমাকে বলতে হবে।

মৃন্ময়ী একটু ইতস্তত করিয়া রুদ্ধশ্বাসে বলিল, বেশ এখুনি বলব। কিন্তু বাইরে যদি কোথাও আপনি প্রকাশ করেন তবে আপনিই বিপদে পড়বেন। ওদের কোনো পরিচয়ই আমি জানি নে; এইটুকু জানি, ওরা বিপ্লবী। মা ওদের পলাতক অবস্থায় আশ্রয় দিয়েছিলেন। এই বলিয়া পুনরায় দ্রুতপদে উপরে উঠিয়া গেল।

২

মোটরে করিয়া ভিজিতে ভিজিতেই বাড়ী আসিয়া পৌঁছিলাম। কালবৈশাখীর দুর্যোগে সন্ধ্যারাত্রে আমার জীবনে এমন একটা নাটকীয় ঘটনা ঘটিল যে, সহসা কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে উৎসাহ পাইলাম না। পথে ঘাটে অসংখ্য যুবক যাহারা অজ্ঞাত অপরিচিত হইয়া চলিয়া ফিরিয়া বেড়ায়, আমি ছিলাম তাহাদেরই একজন, কিন্তু সেই রাত্রে বৃষ্টি-বাদলে কলিকাতার রহস্যময় পথে ভিজা অন্ধকারে আর ঝাপসা আলোয় মোটরের ভিতর বসিয়া আমি যেন সহসা এক নাটকের প্রধান নায়ক হইয়া উঠিলাম। তরুণ বয়সের রস-কল্পনায় যে-সকল অর্বাচীন গা ভাসাইয়া দেয়, তাহারা এক একটা নাটকীয় সংস্থানে আত্মহারা প্রণয়-কাহিনীর বিষয়বস্তু খুঁজিয়া পাইত, কিন্তু আমি ইহাতে একটা বৈষয়িক লাভের সন্ধান আবিষ্কার করিলাম। দু'গাছা সোনার চুড়ি পকেটের ভিতরে রাখিয়া হাত দিয়া মাঝে মাঝে অনুভব করিতে-ছিলাম। মৃন্ময়ী হাত হইতে চুড়ি খুলিয়া দিয়াছে, কিন্তু আমার ঠিকানা লয় নাই। যদি টাকা লইয়া আমি ফিরিয়া না যাই,

তবে কিছুই তাহার করিবার থাকে না। এমন কোন প্রমাণ তাহার নিকট রাখিয়া আসি নাই, যাহার জোরে সে চুড়ি দু'গাছা ফিরিয়া পাইবার দাবী জানাইতে পারে। প্রতারিত হইতে গিয়া প্রতারণা করিয়া আসিলাম, এজন্য নিজের প্রতি শ্রদ্ধা জাগিল। চুড়ি দু'গাছা যখন পাইলাম, তখন মোটরভাড়াটা পকেট হইতে দিতে গায়ে লাগিবে বলিয়া মনে হইল না।

মৃন্ময়ী আমাকে বিশ্বাস করিয়াছে, এমন একটা কথা উঠিতে পারে। কিন্তু যাহার মা ছিল কলঙ্কবতী, যাহাদের জীবনযাত্রার ইতিহাসে সাধুতার কোনও স্থান নাই, তাহাদের নিকট সাধু বলিয়া পরিচিত হইবার মূল্য কতটুকু? মেয়েটার প্রতি আমার একটা ক্ষণিক লোভ জাগিয়াছিল সন্দেহ নাই, উহার সহিত কিছুকাল একটা সম্পর্ক পাতাইলে মন্দ হইত না, কিন্তু সোনার চুড়ি দু'গাছা পাইয়া আমার সেই লোভটা কোথায় যেন উবিয়া গেল। তাহার সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ করিলে চুড়িবিক্রয়ের টাকাও তাহাকে দিতে হইবে এবং তাহাকে হয়ত পাইব না,—এমনও হইতে পারে বিপ্লবী বলিয়া কথিত দুইটি যুবকের দ্বারা আমার কোনও ঘোরতর অনিষ্ট হওয়াও বিচিত্র নয়, তাহার চেয়ে বরং সমস্তটাই গিলিয়া ফেলি। চুড়ি দু'গাছা বিক্রয় করিয়া যাহা পাইব, তাহাতে অমন পাঁচটা মৃন্ময়ী জুটিয়া যাইবে। মৃন্ময়ী অপেক্ষা স্ত্রীলোকই আমার নিকট প্রধান—এমন আদর্শ ও ইহার

উদাহরণ আমার জীবনে বিরল নয়। খুশী হইয়া বাড়ী আসিয়া পৌঁছিলাম। মৃন্ময়ী এতক্ষণ তাহার মায়ের মৃত্যুশয্যার পাশে বসিয়া প্রতি মুহূর্তটি গণিতেছে, এই অসুবিধাজনক অবস্থাটা ভাবিয়া দেখিবার প্রয়োজন আমি আর মনে করিলাম না।

বাড়ীতে ঢুকিয়া মাতৃদেবীকে দেখিয়াই মনে পড়িল যে আমি পিতাকে আনিবার জন্য স্টেশনে গিয়াছিলাম। তিনি আমাকে দেখিয়াই বলিলেন, কই রে, এঁরা এলেন না?

তাঁহার বহুবচনার্থ শুনিয়া রাগ হইয়া গেল। বলিলাম, তোমার পতি-পরমগুরুটি চিরদিন আমাকে এমনি হয়রান করেন।

আমি আদরের পুত্র, সুতরাং বেমক্কা কথা বলাই আমার অভ্যাস। মা বলিলেন, আ, মুখপোড়া। ওই কি তোর কথার ছিরি? তবে কি দিল্লী থেকে রওনা হতেই পারেন নি?

বলিলাম, খুব সম্ভব লাড্ডু খেয়ে স্ত্রী পুত্রের কথা ভুলেই গেছেন। ভদ্রলোক আমার দার্জিলিং যাওয়াটা মাটি ক'রে দিলেন।

মা রাগ করিয়া বলিলেন, কেবল নিজের যাওয়ার কথাটাই ভাবছিস, এদিকে মানুষটার পথে বিপদ আপদ কিছু ঘটলো কি না, সেদিকে তোর ভ্রূক্ষেপ নেই!

বলিলাম, তাঁর বিপদের চেয়ে বড় বিপদ যদি আমার দার্জিলিং যাওয়া না হয়।

দূর, পোড়ারমুখো। বলিয়া মা চলিয়া গেলেন।

কথাটা মিথ্যে নয়। পিতা আমার এমনি সতর্ক ও সাবধানী পুরুষ যে, তিনি বরং অন্যকে বিপদে ফেলিবেন কিন্তু নিজে বিপন্ন হইবেন না। তাঁহার বিপদের কথা ভাবা অপেক্ষা আমার দার্জিলিং যাত্রা অনেক বড়। দিল্লী হইতে ফিরিবার পথে ট্রেন-সংঘর্ষে তাঁহার মৃত্যু অপেক্ষা কলিকাতায় বসিয়া একশো পাঁচ ডিগ্রী উত্তাপে আমার শোচনীয় মুমূর্ষু অবস্থা অনেক বেশী যন্ত্রণাদায়ক। পিতা মরিলে দুঃখ নাই, কারণ পিতারা চিরদিনই মরিয়া থাকেন, কিন্তু আমার ন্যায় পুত্র মরিলে সমগ্র জাতির পক্ষে ক্ষতিকর, দেশের পক্ষে অপূরণীয় অভাব,—দেশকে এতবড় অনিষ্ট হইতে আমি অবশ্যই রক্ষা করিব। আগামী কাল মৃন্ময়ীর সোনার চুড়ি বিক্রয় করিয়া ও মায়ের অলঙ্কার বন্ধক রাখিয়া আমি কলিকাতা ত্যাগ করিব। পিতা আমার চিরদিনই স্বার্থ-সচেতন, সুতরাং আমি যে কায়মনোবাক্যে তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিব, ইহাতে বিস্ময়ের কি আছে? মাতাঠাকুরাণী অলঙ্কার না দিলে অহিফেন সেবন করিয়া আত্মহত্যা করিবার নামে মদনানন্দ মোদকের বড়ি দেখাইয়া ভয় প্রদর্শন করিব। এমন অনেকবার করিয়াছি। আমার কুড়ি বৎসর বয়স অবধি আমি অবশ্য না বলিয়া কয়েকবার গোপনে পিতৃদেবতার বাক্স হইতে কিছু কিছু লইয়াছি, কিন্তু পিতামাতার দ্বিতীয় সন্তান

জন্মগ্রহণের সম্ভাবনা চলিয়া যাইবার পর হইতে আমি আফিঙ ও দড়ি—দুইটি শব্দ উচ্চারণ করিলেই আমার পায়ের নিকট টাকা-পয়সা জড়ো হইতে থাকে। অবশ্য এখনো একটু অস্বস্তি আছে, উভয়ের একজনের মৃত্যু না হইলে আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছি না। বলা বাহুল্য, দুইজনেই এমন বয়সে উত্তীর্ণ হইয়াছেন যে, একজন মৃত্যুমুখে পতিত হইলে অপর একজন যে পুনরায় বিবাহ করিবেন, এমন সম্ভাবনা কম। তবে বাংলা দেশে সবই সম্ভব, পিতার ন্যায় বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে কিশোরী জুটিতে বিলম্ব হয় না। তবে মাতৃদেবীর সম্বন্ধে আমি নিশ্চিন্ত, তাঁহার ভবিষ্যৎ ঝর্‌ঝরে, অবশ্য বিলাত হইলে কি হইত বলা যায় না।

মনে মনে এই সব যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করিতে করিতে আমি আমার টেব্‌লের নিকট স্থির হইয়া বসিয়া চুড়ি দু'গাছা বাহির করিলাম। আগামী কাল আমার অনেক কাজ। কিছু-কাল হইতে যে দুই একটি বদ্‌অভ্যাস আমার হইয়াছে, তাহার জন্য যদিও আমি আন্তরিক লজ্জিত ও অনুতপ্ত, যদিও আমার ন্যায় কুলাঙ্গার সমাজের পক্ষে ঘৃণ্য,—কিন্তু কি করিব, আমার অভ্যাসগুলি দ্বিতীয় স্বভাবে পরিণত হইয়াছে। অহিফেন অবশ্য আমি সেবন করি না, তবে উৎকৃষ্ট বিলাতী মদ্য আমি একরূপ নিয়মিত ব্যবহার করিয়া থাকি। সুতরাং তাহার সরঞ্জাম এই

পরিমাণে লইতে হইবে, যাহাতে পথে ঘাটে, শীতে ও দুর্যোগে অভাব না ঘটে! দ্বিতীয় কথাটা স্বীকার করিবার পূর্বে আমি একবার ঈশ্বরের নাম করিব, কারণ সকলই তাঁহার ইচ্ছা—সেই হৃষীকেশ আমার হৃদয়ে অবস্থান করিয়া আমাকে যে কাজেই নিযুক্ত করুন, আমি তাহাই করিয়া থাকি। ঈশ্বরের প্রতি আমার অবিচলিত বিশ্বাস ও ভক্তি, তিনি সর্বদাই আমার ভিতরে থাকিয়া আমাকে চালিত করেন, আমার প্রাণ-চাঞ্চল্য তাঁহারই সঙ্কেতে নির্দিষ্ট হয়। সম্প্রতি থিয়েটার ও সিনেমার দুই তিনটি অভিনেত্রীর সহিত বহু অর্থব্যয় করিয়া অন্তরঙ্গতা স্থাপন করিয়াছি, —উহাদের কাহার মুখে কতটা সতীনারীর ছাপ আছে, এবং কাহাকে সঙ্গিনী করিলে আমাকে পথে ঘাটে বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হইবে না, সেই কথা টেব্‌লের নিকট বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম। সেই সঙ্গে হৃষীকেশ আমার প্রাণের ভিতর হইতে কানে কানে আদেশ করিলেন যে, অলঙ্কার না পাইলে পিতার সহি জাল করিয়া আগের মতো ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিয়া লইয়ো, বিপদে পড়িলে একমাত্র বংশধর বলিয়া অবশ্যই পূর্বের ন্যায় উদ্ধার পাইবে। ভয় নাই,—তুমিই ইহাদের শিবরাত্রির সলিতা!

কিন্তু চুড়ি দু'গাছার দিকে চাহিয়া আমার একটু ভাবান্তর ঘটিল। কিছু করিয়া বাড়ী ফিরিলে, এই চুড়ি দেখিয়া একটু নেশা লাগিত। কিন্তু তাহা হইল না। মনে হইল, এই চুড়ির

সহিত মৃন্ময়ীও আসিয়া আমার এই ঘরে দাঁড়াইয়া আমার বিচার বিবেচনাকে নিঃশব্দে পরীক্ষা করিতেছে। ঘরের আলোটা যেন মৃদু, সেই স্বল্প আলোয় আমি যেন দেখিলাম আমার ঘরে সন্ধ্যাবেলাকার বৃষ্টি-বাদল যেন এই চুড়ি দু'গাছার পিছনে পিছনে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে। সব বুঝিলাম। বুঝিলাম আমার মনুষ্যত্বকে বাজাইয়া ইহারা কিছু কাজ গুছাইয়া লইতে চাহে। চুড়ি দু'গাছা যাহার হাতের তাহাকে আমি বাল্যকাল হইতে চিনি সন্দেহ নাই, তাহার গলা ধরাধরি করিয়া শিবের গাজন গাহিয়া বেড়াইয়াছি তাহাও সত্য, সেদিনকার সেই হৃষ্টপুষ্ট বালিকার মাংসল দেহের উষ্ণ ঘন গন্ধে আমার কিশোর রক্তে যে অর্থহীন নিগূঢ় অন্ধ বিপ্লব বাধিয়া যাইত তাহাও নিঃসন্দেহ। কিন্তু আজ? আজ দার্জিলিং যাইবার কালে ছেলেখেলার মতো একটা সাময়িক সঙ্গিনী জুটাইতে পারিলেই আমার কাজ চলিয়া যাইবে। আমি সেই লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অর্বাচীনের ন্যায় মৃন্ময়ীর বিপদে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহাকে উদ্ধার করিব অথবা বিনা পারিশ্রমিকে সোনার বদলে তাহাকে টাকা দিয়া মহানুভবতা প্রকাশ করিয়া আসিব, এত বড় উদারতা বিংশ শতাব্দীতে অচল। মৃন্ময়ীর বয়স কাঁচা, তাহার দু'গাছা চুড়ি গেলে চার গাছা জুটিতে বিলম্ব হইবে না, কিন্তু আমি এই কালবৈশাখীর লটারিতে যাহা পাইলাম তাহা

খোয়াইলে আমার দার্জিলিং যাত্রার আর্থিক সাচ্ছল্য ক্ষুণ্ণ হইবে। তাহা পারিব না।

উঠিয়া ভিতরে গেলাম। পিতা আসেন নাই সুতরাং মা রান্নাঘরে পাচককে উপদেশ দিয়া পিতার জন্য প্রস্তুত করা খাবারগুলির ব্যবস্থা করিতেছিলেন। আমি খাইতে বসিয়া বলিলাম, একটা মজার কথা শুনবে, মা ?

মা মুখ তুলিলেন।

বলিলাম, হাওড়া স্টেশনে একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল, তুমি তাদের চেনো।

কে বল্‌ত ?

সেই যে তারা, তুমি আর বাবা যাদের পথে বসিয়েছিলে ?

ওমা, কে রে ?

বলিলাম, তোমরা নিজেদের কলঙ্ক ভুলেছ কিন্তু তারা তোমাদের কীর্তি ভোলেনি। সরোজিনী আর তার মেয়ের কথা মনে নেই ? সেই যে তোমার হুকুমে বাবা যাদের ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন ?

মা বলিলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে। অনেক দিনের কথা হোলো। সর্বনাশী এখনো বেঁচে আছে ?

সরোজিনীর মৃত্যুশয্যার কথাটা আমি ইচ্ছাপূর্বক চাপিয়া গেলাম। মায়ের চোখে মুখে নারীজাতির যে আদিম হিংস্রতা

ফুটিয়া উঠিতে দেখিলাম তাহাকে প্রশ্রয় দিলাম না। বলিলাম, হ্যাঁ, তার সেই মেয়েটাই এখন বড় হয়ে উঠেছে।

কোথা আছে এখন সে মাগি ?

অত জানিনে, তবে তার মেয়েটা আমাকে দেখে চিন্‌লো। পুরনো কথা তুলে খুব খোঁটা দিলে।

মায়ের চোখ জ্বলিয়া উঠিল। বলিলেন, সাপের বাচ্ছা সাপই হয়। ছোবল মারবে বৈ কি, সেই মায়ের মেয়ে ত' ? পায়ের জুতো খুলে অমনি মারলিনে কেন তুই ?

মায়ের মুখে এই সকল ভাষা আমি সহসা শুনিতে পাই না। তাহাদের অন্যায় ও কলঙ্ক যে কত গভীর তাহা আমি মায়ের মুখের দিকে চাহিয়াই উপলব্ধি করিলাম। বলিলাম, তারা কি করেছিল, মা ?

মা বলিলেন, সে কথায় আর দরকার নেই। শুধু এই কথা ব'লে রাখি, ফের পথে ঘাটে দেখা হ'লে আর মুখ ফিরে চাইবিনে। ওরা বড় নোংরা, ওদের ছায়া মাড়াতে নেই।

কিন্তু ছায়া যে মাড়িয়েছি ইতিমধ্যে।

মা আমার দিকে চাহিলেন। আমি খাইতে খাইতে বাঁ হাতে চুড়ি দু'গাছা তাঁহাকে সোৎসাহে দেখাইলাম। বলিলাম, সরোজিনীর মেয়ে আমাকে এই দু'গাছা দিয়ে বললে, দয়া ক'রে আমাকে কিছু টাকা এনে দিন্, আমাদের বড় বিপদ।

মা স্তব্ধ হইয়া বসিয়া পড়িলেন। বলিলেন, তুই হাত পেতে নিলি কেন ?

তাঁহার মুখের চেহারা বিবর্ণ ও যন্ত্রণাকাতর হইতে দেখিয়া আমি প্রথমে একটু যেন অনুতপ্ত হইলাম। কিন্তু পরে বলিলাম, আমি তোমার অত্যন্ত বাধ্য আর চরিত্রবান্ ছেলে। তুমি যদি আমাকে আগে থেকে শিখিয়ে রাখতে যে, ওদের কোনো জিনিষ আমি কখনও স্পর্শ করব না, তাহ'লে আমি একবার ভেবে দেখতুম। কিন্তু তুমি তা' ব'লে রাখোনি। এখন কি উপায় তাই বলো।

মা বলিলেন, টান মেরে ফেলে দিয়ে আয়।

বলিলাম, পরের জিনিষ ফেলে দেবো, অধর্ম হবে যে। তা' ছাড়া টাকা এনে দেবো ব'লে হাত পেতে নিয়েছি। আর কিছু নয় মা, জীবে দয়া!

মা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, ওই চুড়ি বিক্রি করতে যাওয়া হবে না,—হয়ত গিল্‌টি, তুই হয়ত ধরা পড়বি পুলিশের হাতে—ওরা সব পাপই করতে পারে। আমি টাকা দিচ্ছি, কুকুরের মুখে যেমন মাংস ছুঁড়ে দেয়, এই টাকা আর চুড়ি তেমনি ক'রে ওদের কাছে ফেলে দিয়ে আসবি। ফিরে এসে চান ক'রে ঘরে উঠবি।—এই বলিয়া তিনি রাজমাতা ভিক্টোরিয়ার ন্যায় দৃপ্ত ভঙ্গীতে চলিয়া গেলেন। উপরের দালান হইতে

একবার গলা বাড়াইয়া বলিলেন, যত রাত্রিই হউক আমাকে যাইতেই হইবে, ওই নোংরা বস্তু ঘরে রাখা হইবে না।

আহার সারিয়া মায়ের নিকট ত্রিশটাকা লইয়া শুভ-ক্ষণে দুর্গা বলিয়া যাত্রা করিলাম। পথে নামিতেই এক সাইকেল-ওয়ালা ডাকপিওন হাতে একখানা টেলিগ্রাম দিল। টেলিগ্রাম বাবার। খুলিয়া পড়িয়া দেখি, তিনি জানাইয়াছেন, তাঁহার আসা হইল না, দুইদিন পরে আসিয়া পৌঁছিবেন। মনে মনে পিতার মুণ্ডপাত করিলাম এবং মাকে জব্দ করিবার জন্য টেলিগ্রামের কথা না জানাইয়াই বাহির হইয়া পড়িলাম। পকেটে ত্রিশটা টাকা ও সোনার চুড়ি, আজ রাত্রিটা ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমার ভালোই কাটিবে। ইচ্ছা করিয়া অল্প খাইয়াছি, নেশা করিবার মতো জায়গা পেটে বেশ আছে। রাত্রে আর ফিরিব না, চিরকালের অভ্যাস মতো কাল সকালে আসিয়া একটা মিথ্যা রোমাঞ্চকর গল্প বলিব, এবং আমি জানি মা বিশ্বাস করিবেন। কলিকাতার রাত্রির পথ মধুর বোধ হইতে লাগিল।

মা যতটা নোংরা বলিলেন ততটা নোংরা আমার মনে হয় নাই। স্ত্রীলোকের নিকট স্ত্রীলোক যতটা নোংরা, এমন তাহারা পুরুষের চক্ষে নহে। পৃথিবীতে স্ত্রী-কবি অনেক জন্মিয়াছেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহাদের খ্যাতি নারীবন্দনা কাব্যের জন্য নহে,—যেমন পুরুষ-কবির বেলায় খাটে। নারীর মুখে নারীর

স্তাবকতা পৃথিবী এখনো শুনে নাই। যাহা হউক, আমি মৃন্ময়ীর ব্যবহারে ও আচরণে কোথাও মালিন্য লক্ষ্য করি নাই। ইহা সত্য, সে আমার সাহায্য চাহিয়াছে কিন্তু কিছু দাবি করে নাই; আমার মানবতার প্রতি আবেদন জানাইয়াছে, কিন্তু ছলনার সঙ্কেতে অভিভূত করিতে চাহে নাই। কবে তাহাদের কোন্ অন্যায়ের কথা মা মনে করিয়া আজিও তাহাদের তিরস্কার করিলেন, আমি কিন্তু ইহার সঙ্গত যুক্তি খুঁজিয়া পাইলাম না। তাহাদের অন্যায়টা চারিত্রিক অথবা বৈষয়িক তাহা আমার অজ্ঞাত। যদি চারিত্রিক হয় তবে আমার অপেক্ষাও তাহারা হীন একথা স্বীকার করিতে আমার অহঙ্কারে বাধে; যদি বৈষয়িক, তবে তাহাদের অপেক্ষা আমি কম জুয়াচোর ইহা স্বীকার করিবার আগে আমি অহিফেন সেবন করিয়া আত্মহত্যা করিব। নিজের অধঃপতন লইয়া আমি গৌরব করি না বটে, কিন্তু মৃন্ময়ীরা আমা অপেক্ষাও অধঃপতিত—একথা আমি মানি না।

যাহা মনে করিয়াছিলাম তাহা হইল না। মায়ের রুদ্রাণী মূর্তির উগ্রকণ্ঠ আমাকে যেন মৃন্ময়ীদের বাড়ীর দিকেই ঠেলিয়া লইয়া চলিল। আকাশ পরিষ্কার হইয়াছে, গ্রীষ্মকালের রাত দশটা এমন কিছু গভীর রাত নহে, আমি আবার গোয়াবাগান হইতে যাইবার জন্য ট্রামে উঠিয়া বসিলাম। আজকার রাতটা

আমি চরিত্র রক্ষা করিব। ইহা দেখিব, আমার এই সংযমের বিনিময়ে আমি কতটুকু শ্রেষ্ঠতর বস্তু আদায় করিতে পারিব। মৃন্ময়ীর মা মরিতেছে, আর তাহার মাথার উপর কেহ থাকিতেছে না। যে দুইটা অজ্ঞাতকুলশীল যুবককে দেখিয়া আসিয়াছি তাহাদের পুলিশের ভয় দেখাইয়া অবশ্যই তাড়াইতে পারিব,—তাহার পরে মৃন্ময়ী আমার কবল হইতে আর যাইবে কোথায়? বাল্যকালে আমি তাহার খেলার সাথী ছিলাম, কিশোরকালে তাহার শিবের গাজনের সঙ্গী ছিলাম, যৌবনকালে যদি মাস-খানেকের জন্য তাহার প্রিয়তম না হইতে পারিলাম, তবে আজ এই রাত্রে কোমর বাঁধিয়া তাহাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে যাইতেছি কোন্ নির্বুদ্ধিতায়? মা মরিলে আজ রাত্রে সে কাঁদিবে, কাল রাত্রে আমার সহিত দার্জিলিং যাইতে পাইয়া হাসিবে, কারণ আমার মনে হয় স্বামী ও সন্তান ছাড়া আর কাহারও মৃত্যু স্ত্রীলোকের মনে গভীর রেখাপাত করে না। মায়ের মৃত্যুতে যদি সে আলুথালু হইয়া কাঁদিবার চেষ্টা করে তবে আমি তাহাকে চোখ টিপিয়া ভালোবাসার লোভ দেখাইয়া থামাইব। এবং আড়ালে লইয়া গিয়া মৌখিক অভয় দান করিব। মৃন্ময়ীর চোখে মুখে আমি একটি কৌমার্যময় শুচিতা লক্ষ্য করিয়াছি, ভ্রষ্টচরিত্রের যুবক হইয়া সেই বস্তুটির প্রতি স্বাভাবিক প্রলোভন আমি অবহেলায় ত্যাগ করিতে

পারিব না। মায়ের তিরস্কারই আমাকে যেন উৎসাহিত করিল।

বাসাটা ভুলি নাই, সটান আসিয়া কলুটোলার পথে সে গলিটা বাহির করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম। অন্ধকারে হাতড়াইয়া গলির সর্বশেষ দরজায় ঢুকিয়া সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিলাম।

মৃত্যুর দৃশ্য দুই চারিবার আমি দেখিয়াছি, একবার দুর্বলতা-বশত কবে জানি চোখে রুমালও চাপা দিয়াছিলাম, কিন্তু এখানে আসিয়া জীবন সম্বন্ধে নূতন করিয়া আমাকে চিন্তা করিতে হইল। উপরে উঠিয়া ঘরের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। ভিতরে আলো তেমনিই জ্বলিতেছে, মৃন্ময়ী তেমনি নির্বিকার নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছে। আমাকে দেখিয়া বলিল, আসুন। আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলুম।

রোগীর নিশ্চল অবস্থা দেখিয়া আমি প্রশ্ন করিলাম, এখন অবস্থা কেমন ?

মৃন্ময়ী কহিল, আপনি যাবার মিনিট দশেক পরেই মারা গেছেন। আপনাকে এই রাত্রে ভারি কষ্ট দিলুম, আমাকে ক্ষমা করবেন।

তাহার বলিবার সহজ ভঙ্গী দেখিয়া আমি স্তব্ধ ও নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলাম। কণ্ঠস্বরে তাহার এতটুকু কারুণ্য,

এতটুকু অসহায়তা নাই। সন্তান হইয়া মায়ের মৃতদেহের কাছে এমন নির্বিকার ভাবে কেহ বসিয়া থাকিতে পারে আমি কল্পনাও করিতে পারি না। অন্য দিকটাও আছে। কে সৎকার করিবে, কে মড়া বহিয়া শ্মশানে লইয়া যাইবে, তাহার নিজের উপায় কি হইবে, আগামী কাল সকালে অভিভাবকহীন অবস্থায় সে কোথায় দাঁড়াইবে—এই সব চিন্তা সে করিতেছে কিনা জানি না, কিন্তু তাহার মুখ দেখিয়া আমার মনে হইতে লাগিল, এ সব কিছুই তাহাকে স্পর্শ করিতেছে না। তাহার শান্ত ও অবিচলিত ভাবের মধ্যে যেন একটা সুদূর কাঠিন্য ও রুক্ষতা আবিষ্কার করিতে পারিলাম।

ঘরের ভিতরে পা বাড়াইতে আমার যেন মন উঠিল না। কেবল গলা বাড়াইয়া এক সময় প্রশ্ন করিলাম, সেই ছোক্‌রা দু'জন কোথায় গেল?

মৃন্ময়ী উঠিয়া আসিল, বলিল, এ ঘরে লোকজন আসবে, তাদের পক্ষে এখানে থাকা বিপজ্জনক। আমি তাদের সরিয়ে দিয়েছি।

ব্যস্ত হইয়া বলিলাম, সে কি, তোমার ত লোকজন কেউ নেই, আজকের বিপদ থেকে উদ্ধার পাবে কেমন ক'রে?

মৃন্ময়ী সহজ কণ্ঠে বলিল, বিপদ? মানুষ জন্মালেই মরে, মা সকালে বেঁচে ছিলেন এখন আর নেই—এটা আর এমন কি

বিপদ, রাজেনবাবু? এই ত' বিছানাতেই রয়েছেন, তবে প্রাণটা আর নেই—এই মাত্র!

ডাকিনীর মুখের দিকে আমি চাহিলাম, তাহার মুখ দেখিয়া আমার ভয় করিতে লাগিল। নিকটে ও দূরে জনমানব কেহ নাই, তখনকার সেই ছাপাখানার শব্দটাও থামিয়া গিয়াছে, বৃষ্টি-বাদল বন্ধ হইলেও পথে লোক-চলাচল আর নাই বলিলেও হয়,—আর ভিতরে একা এই দুঃসাহসিকা মৃতদেহ পাহারা দিয়া অপেক্ষা করিতেছে। মনে করিলাম, ত্রিশটা টাকা ও সোনার চুড়ি দু'গাছা ইহার হাতে দিয়া আমি পলাইয়া যাই, এই একটা অদ্ভুত আকস্মিক ঘটনার জালে জড়াইয়া ও বিপদে মাথা দিয়া আমার ঘুরপাক খাইবার প্রয়োজন নাই, কিন্তু মৃন্ময়ীর টস্‌টসে যৌবন ও গ্রীবাভঙ্গী দেখিয়া আমি পুনরায় লুব্ধ হইয়া উঠিলাম। বলিলাম, তাহ'লে এসব করবে কে?

মৃন্ময়ী বলিল, আপাতত আপনাকেই এসব করতে হবে।

আমাকে?—বিস্মিত হইয়া বলিলাম, কী বলছ তুমি, মীনু? এসব ত' আমার অভ্যাস নেই। আর তাছাড়া আমাকে এখুনি ফিরতে হবে। আর তাছাড়া—

মৃন্ময়ী গলার আওয়াজে যেন একটু জোর দিয়াই বলিল, আপনার সঙ্গে সন্ধ্যার সময় দেখা না হ'লে কি করতুম এখন

আর বলতে পারিনে, কিন্তু দেখা যখন হয়ে গেল তখন আপনাকেই সব করতে হবে।

তোমাদের আত্মীয়স্বজন কেউ থাকলে আমি না হয় খবর দিতে পারতুম।—আমার কণ্ঠে পুনরায় প্রতিবাদ ফুটিল।

আমার কেউ নেই।—মৃন্ময়ী বলিল।

কিন্তু একা ত' সব করা যায় না, মৃন্ময়ী ?

মৃন্ময়ী বলিল, একাই সব করা যায়। আমি অপেক্ষা করি, আপনি গিয়ে সৎকার সমিতিতে খবর দিন, তারা গাড়ী এনে নিয়ে যাবে। রাজেনবাবু, আপনি আর দাঁড়াবেন না, বেরিয়ে পড়ুন। আপনি পুরুষ মানুষ, ভয় কি ?

সে যেন আমাকে ঠেলিয়া সিঁড়ি দিয়া নামাইয়া দিল। তাহার চেহারা দেখিয়া আমার প্রতিবাদ করিবার সাহস হইল না, এবং পলাইবার চেষ্টা করিতে গিয়াও যেন পৌরুষে আঘাত লাগিল। মনে একটা সান্ত্বনা রহিল এই যে, আগামী কাল ইহাকে আমি আমার কবলে পাইব, ও ইহার অভিভাবকহীন অবস্থাটার সুযোগ লইয়া কিছুকাল সরস জীবন অতিবাহিত করিতে পারিব।

ইহার পরে সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত না বলিলেও চলে। মৃন্ময়ী আমাকে পুরুষ মানুষ বলিয়াছে, সুতরাং অনিচ্ছাসত্ত্বেও কোনো কাজ হইতে পিছাইতে পারিলাম না। রাত্রি বারোটার সময়

গাড়ী আনিয়া মৃতদেহ শ্মশানে লইয়া গেলাম। মৃন্ময়ী কাঁদিল না, কোনো কাজেই পিছাইল না, কেবল যখন তাহার মাতাকে চিতার উপর চড়ানো হইল, তখন তাহার কণ্ঠস্বরটা একবার কাঁপিয়া উঠিল। বলিল, রাজেনবাবু, আর আমার কেউ রইল না।

আমি তাহার দিকে একবার চাহিলাম। সত্য বলিব, ইতি-মধ্যেই আমার একটা শ্মশান-বৈরাগ্য আসিয়াছিল। আমি যেন ক্ষণকালের জন্য তাহার প্রতি আমার বর্বরোচিত আসক্তি, তাহার রূপ, তাহার যৌবন, আমার স্বার্থপরতা ও চিত্তমালিন্য—সমস্তই ভুলিয়া গেলাম। আগামী কাল প্রভাত হইতে এই তরুণীর জীবনে যে ঝটিকা ও সংগ্রাম ও সংঘর্ষ স্থুরু হইবে, আমি যেন তাহার সেই দীর্ঘ ইতিহাসটা মানস চক্ষে দেখিতে পাইলাম। চিরদিন নিজের দিক হইতেই পৃথিবীকে বিচার করিয়াছি, আত্ম-পরতাকেই সকলের আগে স্থান দিয়াছি এবং নিজের স্থযোগ-স্থবিধা ভিন্ন আর কাহারও সমস্যাকে কখনও বিচার করিয়া দেখিবার অবসর পাই নাই। কিন্তু আজ রাত্রিশেষের অন্ধকারে নদীতীরবর্তী শ্মশানের চিতাগ্নির আভায় আমি যেন পলকের জন্য সমগ্র পৃথিবীর মুখের দিকে চাহিয়া চিন্তা করিলাম, নিজের পাওনা-গণ্ডাই সর্বাগ্রগণ্য নয়, কিন্তু ভাগ্য-বিড়ম্বিত হতমান জীবনের নিরুপায় লাঞ্ছনা, যাহা দুঃখে ও দুর্দশায় জর্জর, তাহার সমস্যা অনেক বড়।

বলিলাম, মৃন্ময়ী, কেউ যার নেই তার পিছনেও একজন থাকে, তুমি সেইদিকে চোখ রেখো।

মৃন্ময়ী আমার কথার জবাব দিল না, কেবল নীরবে জ্বলন্ত চিতার দিকে তাকাইয়া রহিল। যে-কথাটা আমি সহসা বলিয়া ফেলিলাম তাহার সম্যক্ অর্থ আমি নিজেও বুঝিলাম না। নিরুপায়ের পিছনে ঈশ্বর আছেন এমন আজগুবী কথা আমি বলিবার চেষ্টা করি নাই, তাহার পিছনে আমি আছি—এমন বেয়াড়া ও দায়িত্ব-জ্ঞানহীন উক্তিও আমার মুখ দিয়া বাহির হইবে না, কিন্তু বৈরাগ্যের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া বোকার মতো এমন একটা মন্তব্য করিলাম যাহা তাহাকেও উৎসাহিত করিল না, নিজেও তাহার নিকট সুস্পষ্ট হইলাম না।

ভোরের দিকে পথে ঘাটে যখন লোকজন জাগে নাই তখন মৃন্ময়ীকে বাসার কাছে পৌঁছিয়া দিয়া আমি বাড়ী ফিরিয়াছিলাম। কথা ছিল, আমি মধ্যাহ্নে আহারাদি করিয়া তাহার নিকট আসিব, সে যেন ইতিমধ্যে কোথাও না গিয়া আমার জন্য অপেক্ষা করে।

গতকাল তাহার সম্বন্ধে যেসকল সুখ-কল্পনা করিয়াছি আজ তাহাতে যেন উল্লাস বোধ করিতে পারিলাম না। তাহার সহিত প্রণয় করিব এবং মাসখানেক পরে আখের ছিবড়ার ন্যায় তাহাকে পথের ধারে ফেলিয়া যাইব—আমার এই মনোভাব আমাকে

যেন আর উৎসাহিত করিল না। এই ভাবিয়া আমার ভয় হইল যে, উহার সহিত মেলামেশা করিতে গেলে আমি এমন ভাবে হয়ত জড়াইয়া পড়িব যে, সেই জাল ছিঁড়িয়া বাহির হওয়া কঠিন হইবে। আমি স্বার্থপর ও লোভী সন্দেহ নাই, কিন্তু আমার স্বার্থপরতা ও লোভ নির্দয়ভাবে একজনের জীবনকে পদদলিত করিয়া সম্পূর্ণতা লাভ করিবে ইহা যেন অতিশয় অমানুষিকতা মনে হইতে লাগিল। আখের ছিবড়ার মতো তাহাকে ফেলিয়া দিলে সে কোথায় আশ্রয় পাইবে, এই কথাটা মনে হইতেই আমি নিরুৎসাহ বোধ করিলাম। যাহার পিছনে স্থিতি-স্থাপকতা আছে অথবা সামান্য একটা শিকড় আছে, তাহাকে লইয়া সাময়িক-ভাবে আনন্দ উপভোগ করা চলে, কিন্তু মৃন্ময়ীর কিছুই না থাকার জন্য সে আমার নিকট একটা সমস্যা হইয়া দাঁড়াইবে, ইহাতে আমি একটু বিপন্ন বোধ করিলাম। অসচ্চরিত্রা স্ত্রীলোক আমার পক্ষে নিরাপদ, কাছেই টানি অথবা দূরে ফেলিয়া দিই, কিছুই যায় আসে না—এক ঘাটের জল ফুরাইলে অন্য ঘাটে গিয়া সে তৃষ্ণা নিবারণ করিবে, আমি মুক্তি পাইয়া বাঁচিব; কিন্তু মৃন্ময়ীর যদি চরিত্রশুচিতা থাকে তবেই আমার পক্ষে বিপদ, কারণ স্ত্রীলোকের সম্ভ্রম সম্বন্ধে দায়িত্ব-বোধ আসিলে প্রাণের আনন্দে আর স্বেচ্ছাচার করিয়া বেড়াইতে পারিব না, সে আমার পক্ষে একটা প্রধান সমস্যা হইয়া দাঁড়াইবে।

তেমন সমস্যা যাহাতে না দেখা দেয় তাহারই চেষ্টা করিব। নীতিজ্ঞান টনটনে থাকিলে এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে বহু রকমের আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকিতে হয়—বিংশ শতাব্দীর সন্তান হইয়া এতখানি উদার আমি হইতে পারিব না। সুতরাং মাছও ধরিব অথচ জলস্পর্শ করিব না—এইরূপ স্থির করিয়া নির্জন মধ্যাহ্নকালে গা ঢাকা দিয়া আমি পুনরায় মৃন্ময়ীর কুঞ্জে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

উপরে উঠিয়া ঘরের দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলাম। মৃন্ময়ী জামাকাপড় পরিয়া, মেঝের উপরেই বসিয়া কি যেন লেখাপড়া করিতেছিল, মুখ তুলিয়া বলিল, আসুন, আপনার অপেক্ষাতেই রয়েছি।

বলিলাম, ঘরের জিনিষপত্র গেল কোথায় ?

মৃন্ময়ী কহিল, সকাল বেলা লোক ডেকে এনে সব বিক্রি করেছি। আমার ত' আর কোনো দরকার রইলো না।

কিন্তু বাঁচতে গেলে সবই ত' লাগবে, মৃন্ময়ী ? তুমি যাচ্ছ কোথায় ?

মৃন্ময়ী আমার দিকে মুখ তুলিয়া ম্লান হাসিল। বলিল, যেদিকে দু'চোখ যায়। দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, ভেতরে আসুন ?

বলিলাম, বসতে দেবার ত' কিছুই রাখোনি, কোথায়

বসবো ? তুমি এমন একটা কাণ্ড করেছ যেটা পুরুষ মানুষকেই মানায়, মেয়েদের পক্ষে বে-মানান।

সেটা কি বলুন ত' ?

রাগ করিয়া বলিলাম, যে দিকে দু'চোখ যায়—এ কথা বলা আমাদের সহজ, আমরা কৌপীন এঁটে মজুরী ক'রে দিন চালাতে পারি, কিন্তু তোমাদের পক্ষে এই বাহাদুরী সম্ভব নয়।

মৃন্ময়ী কি যেন ভাবিতে লাগিল। মনে হইল আমার কথাটা সে গ্রাহ্যই করে নাই, আমার মন্তব্যে তাহার কিছুই যায় আসে না। তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া পুনরায় বলিলাম, তোমার এমন একটা লক্ষ্য হয়ত আছে যেটা তুমি আমার কাছে প্রকাশ করতে চাও না, কি বলো ?

মৃন্ময়ী পুনরায় মৃদু হাসিল এবং যাহা আমি প্রত্যাশা করি নাই, সেই তিরস্কার সে সহজেই আমাকে করিয়া বসিল। বলিল, ঠিকই বলেছেন। আপনার কাছে আমার মনের কথা কেনই বা প্রকাশ করব ?

কেন করবে না ?—নিজের কণ্ঠে জোর দিলাম।

সুস্পষ্ট চক্ষে সে আমার দিকে চাহিল। তাহার সেই নিঃসঙ্কোচ ও সহজ দৃষ্টির কাছে আমি যেন কিছুতেই মাথা তুলিয়া থাকিতে পারিলাম না। সে কহিল, আপনার সাহায্যের জন্য কাল থেকেই আমি উপকৃত, আপনার উপকার আমি মনে

রাখবো। কিন্তু আপনার এই ছেলেমানুষী দাবি কেন? আপনার অনুরোধেই এতক্ষণ আমি বসেছিলুম। আমি কোথায় যাবো অথবা কি করবো, এ আপনি শুনতে চাইবেন না, রাজেনবাবু।

সে যেন আরো কি বলিতে যাইতেছিল, আমি পকেট হইতে তাহার দু'গাছা চুড়ি ও পনেরোটি টাকা বাহির করিয়া তাহার নিকট রাখিলাম। সে কহিল, চুড়ি আপনি বিক্রি করেননি?

বলিলাম, না, সময় পাইনি। তিরিশ টাকা ছিল, তার মধ্যে পনেরো টাকা তোমার মায়ের কাজে খরচ হয়েছে। তোমার চুড়ি নিয়ে যাও।

তাহ'লে তিরিশ টাকা আপনি আমাকে দান করলেন? আপনি তাহ'লে একজন মস্ত দাতা বলুন?

ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলাম, সামান্য টাকার জন্যে বিদ্রূপ ক'রো না, মৃন্ময়ী?

সামান্য?—মৃন্ময়ী হাসিয়া বলিল, আপনার কাছে যেটা সামান্য, আমার কাছে সেটা এক মাসের খাই খরচ। আপনাদের মতন ধনী লোক দেশে আছে ব'লেই ত' আমাদের দিন চলে! আচ্ছা, এবার আপনার কাছে বিদায় নেবো, রাজেনবাবু।

বলিলাম, একটা কথার জবাব চাই, মীনু।

কি বলুন?

তোমার মায়ের 'পরম শত্রু' আর পাষণ্ড ব'লে তুমি যাকে স্টেশনে আনতে গিয়েছিলে, সে কে ?

মৃন্ময়ী বলিল, ওটা মাটীর তলায় চাপা পড়েছে, সুতরাং আপনার প্রশ্নের উত্তর দেবো না।

পুরাতন উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করিলাম, কোথায় গিয়ে থাকবে তুমি ?

সেকথা আপনি জানতে চান্ কেন ?

বলিলাম, ছেলেবেলায় আমি তোমার শিবের গাজনের সঙ্গী ছিলুম সেই অধিকারে জানতে চাই।

মৃন্ময়ী বলিল, সে অধিকার আপনার মা-বাবা নষ্ট করেছেন আমাদের ঘর জ্বালিয়ে। এই বলিয়া সে বাহির হইয়া আসিল।

আমার যেন একটা ব্যাকুলতা জন্মিল। মনে হইল, সে চলিয়া গেলে তাহার সহিত আমার অনেকখানি যাইবে। কম্পিত কণ্ঠে বলিলাম, তবে এক রাত্রির পরিচয়ের অধিকার নিয়ে জানতে চাইছি। জানতে চাইছি, মনুষ্যত্বের অধিকারে —বলো মৃন্ময়ী !

বড়লোকের মনুষ্যত্ব ?—এই বলিয়া হাসিতে হাসিতে মৃন্ময়ী নীচে নামিয়া গেল। আমি যেন ভয়ানক অপমান বোধ করিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

৩

স্ত্রীলোকের বিদ্রূপে সেদিন অপমান বোধ করিয়া বাড়ী ফিরিবার পর কয়েক দিন কাটিয়া গিয়াছে। ক্ষত গভীর হইলেও ঘা একদিন শুকায়, মানুষ আবার নিজের সুবিধাজনক পথ আবিষ্কার করিয়া লয়, ইহাই রীতি। মৃন্ময়ীর বিদ্রূপের স্মৃতি ফিকা হইয়া আসিল, অপমান আর মনে রহিল না। কিন্তু এই কথাটা ভাবিয়া মনটা টনটন করিতে লাগিল যে, অস্খলিতকৌমার্য একটি তরুণীকে হাতের মুঠায় পাইয়াও হারাইলাম। বড়লোক বলিয়া খোঁচা দিয়া গেল, বাল্যবন্ধুত্বকে অস্বীকার করিল, একরাত্রি ধরিয়া তাহার অসময়ে উপকার করিলাম, তাহা সে ভুলিল, দানের কৃতজ্ঞতাকে গ্রাহ্য করিল না, —এবং সর্বোপরি, এই যে আমার তরুণ বয়স, এই যে আমার বিস্তৃত বক্ষপট ও বলিষ্ঠ বাহু—ইহাদেরও সে মুখ বাঁকাইয়া উপেক্ষা করিয়া চলিয়া গেল। সকল গুণের অধিকারী হইয়াও আমি তাহার ন্যায় একটা সমাজচ্যুতা অভিভাবকহীনা স্ত্রীলোকের নিকট ঠাঁই পাইলাম না, ইহা বিস্ময়ের বিষয়।

তাহার এই অহঙ্কারের মূল ভিত্তি কোথায়, তাহা জানিতে ইচ্ছা করে। আমি তাহাকে অধঃপতনের পথে লইয়া গেলেও তাহার গৌরববোধ করা উচিত; আমার বংশমর্যাদা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার আভিজাত্য স্মরণ করিয়া সানন্দে আমার পায়ের তলায় তাহার প্রাণ দেওয়া কর্তব্য—কিন্তু কোন্ আত্মাভিমান তাহাকে এই সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত করিল, বুঝিলাম না। তবে কি পুরুষকে না পাইলেও মেয়েরা কাজ চালাইতে পারিবে? তবে কি মৃন্ময়ী অন্যের প্রতি আসক্ত?

স্ত্রীলোকের রুচি ও স্বাতন্ত্র্য বলিয়া কোনো পদার্থ আছে, তাহা এই প্রথম আবিষ্কার করিলাম। তাহাদের ভিতরে কিছু নাই বলিয়াই উপরটা অত সুন্দর, তাহাদের প্রাণের চেহারায় কোনো রং নাই বলিয়াই উপরটা অত মনোহর। পশুরাজ্যে স্ত্রীজাতির রূপ নাই ও পুরুষের বুদ্ধি নাই; প্রকৃতি নিজের কাজটা একরকম করিয়া সারিয়া লয়। কিন্তু মানবজাতির মধ্যে পুরুষের বুদ্ধি ও মস্তিষ্ক থাকার জন্য প্রকৃতিদেবীর বড় অসুবিধা হইয়াছে। তিনি তাড়াতাড়ি নিজের ফাঁক ঢাকিবার জন্য মেয়েদের মাথায় রেশমের গোছার ন্যায় চুলের রাশ দিয়াছেন, গায়ের চামড়া ঢাকিয়াছেন অতি মসৃণ মখমলে, চোখের দৃষ্টিতে দিয়াছেন মধুরতম মিথ্যার ইঙ্গিত, চরণ দু'খানি করিয়াছেন কমল-পল্লব; এবং শরীরের অন্যান্য স্থানে এমনই

উপকরণ সাজাইয়া রাখিয়াছেন, যাহা পুরুষের মস্তিষ্ক ও বুদ্ধিকে বিকৃত করিবার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু মৃন্ময়ীর এই দম্ভ দেখিয়া আমার একটু ভাবান্তর ঘটিল। স্ত্রীলোক সম্বন্ধে এখন হইতে আমাকে নূতন করিয়া চিন্তা করিতে হইবে, এই চিন্তাটাই আমার নিকট পীড়াদায়ক বোধ হইল। আমার প্রলোভনে সে প্রলুব্ধ হইবে এবং আমার ভালোবাসা পাইয়া সে ধন্য হইবে, ইহাই জানিতাম; কিন্তু মৃন্ময়ীর স্পর্ধা আমাকে চিন্তিত করিয়া তুলিল।

ব্যাঘ্রের কবল হইতে শিকার পলাইলে তাহার কিরূপ অবস্থা হয়? নখর ফুলাইয়া, নিজের থাবা চাটিয়া, গোঁ গোঁ করিয়া হিংস্রভাবে পদচারণা করিয়া বেড়ায়। মৃন্ময়ী পলাইবার পরে আমি বাড়ীর সহিত বিবাদ করিলাম, মাকে ধমক দিলাম, চাকর-বাকরকে খুব প্রহার করিলাম, নেশা করিয়া স্বেচ্ছাচার করিয়া বেড়াইলাম। এই ভাবে মনের দূষিত বাষ্প খানিকটা নির্গত হইবার পর আমার চৈতন্য ফিরিল এবং কবির ভাষায়—'তাহারেও বাদ দিয়া দেখি বিশ্বভুবন মস্ত ডাগর।' আমি পুনরায় অন্য শিকারের সন্ধানে বেড়াইতে লাগিলাম।

আজ কয়েকদিন হইল পিতৃদেব দিল্লী হইতে ফিরিয়া অসুখে পড়িয়াছেন। অসুখ তাঁহার নূতন নহে, অসুখটা বার্ধক্যের। এদিকে আমার দার্জিলিং যাওয়া ঘটে নাই,—পিতার অসুখের জন্যও বটে ও অসময়ে বর্ষা আরম্ভ হইয়াছে সে-কারণেও।

সকাল হইতে সন্ধ্যা অবধি এলোপ্যাথী, হোমিওপ্যাথী ও কবিরাজী মিলাইয়া পিতৃদেবের পেটের ভিতরটাকে একরূপ ঔষধালয় বানাইয়া তুলিতেছি। কিন্তু তাঁহার অসুখ বাড়িতে লাগিল।

একদিন বাবা আমাকে ডাকিলেন। কাছে গিয়া বসিলাম। তিনি বলিলেন, তোমার মায়ের কাছে শুনলুম সরোজিনীদের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে, তারা এখন কোথায়?

পিতার কৌতূহলটা আমার কানে বাজিল; কিন্তু আত্ম-রক্ষার্থে তাড়াতাড়ি বলিলাম, হ্যাঁ, সে একদিন দেখা হয়েছিল বটে, আর কোনো খবর রাখিনে। সরোজিনী ত' মারা গেছেন।

বলো কি?

আজ্ঞে হ্যাঁ, তাঁর মৃত্যুর দিনেই মেয়ের সঙ্গে দেখা, আমার কাছে মেয়েটি কিছু সাহায্য চেয়েছিল।

বাবা বলিলেন, হ্যাঁ, শুনেছি সব। তাহ'লে সরোজিনী মারা গেল? অনেক দুঃখ পেয়েছে বটে।

বলিলাম, আপনি ত' তাদের ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন, বাবা?

মিথ্যে নয়।

কেন দিলেন?

আমরা ছিলুম জমীদার, তারা প্রজা।

বলিলাম, তারা কিছু দোষ করেছিল ?

বাবা চুপ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন, তোমার মায়ের হুকুম পালন করেছিলুম।

একটু প্রশ্রয় পাইয়া প্রশ্ন করিলাম, গরীবের ঘর জ্বালাবার হুকুম মা দিল কেন ?

বাবা যেন কি ভাবিলেন, পরে কহিলেন, অপরাধ একটু ছিল বৈকি। তারা মাথা হেঁট ক'রে থাকতে চায়নি, চেয়েছিল সমান সমান অধিকার! দারিদ্র্যটা ছিল তাদের অহঙ্কার, গরীব ব'লেই তাদের স্পর্ধা ছিল অনেক উঁচুতে। তারা ভেঙেছে, কিন্তু মচ্‌কায়নি।

আমি যেন সহসা নূতন আলোয় পৃথিবীর দিকে চাহিলাম। সরোজিনীর মৃত্যুশয্যাটা চোখের উপর ভাসিল। সেই মুখে মৃত্যুর পাণ্ডুরতার ছায়ায় চরম দারিদ্র্যের কোনও মহিমা ছিল কিনা—প্রদীপের আলোয় সেই অস্পষ্ট দৃশ্য আমার মনে পড়িল না। লোভে ও আত্মপরতায় আমি যখন জরজর হইয়া মৃন্ময়ীর দিকে চাহিয়াছিলাম, তখন তাহার আচরণ ও ভঙ্গীতে উন্নত রুচির দীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছিল কিনা তাহাও এখন আর স্মরণ করিতে পারি না। তবু মনে মনে সেই দিনকার সমস্তটা ভাবিয়া আমার ন্যায় মাংসলোভীও লজ্জায় মাথা নত করিল। ভাবিলাম,

আমার কৌশল-কুটিল নীচতা ও কুৎসিত লোভ হয়ত মৃন্ময়ী সত্যই ধরিয়া ফেলিয়াছে, হয়ত আমার হৃদয়হীনতার দৈন্য ও কদর্যতা তাহার নিকটে আর চাপা নাই।

বলিলাম, মা'র কাছে আমি অন্য কথা শুনেছিলুম, বাবা।

তিনি বলিলেন, তোমার মা কখনও চরিত্রের অপরাধ ক্ষমা করেন না, রাজেন।

নিজের চরিত্রটা স্মরণ করিয়া আমি একটু ভয় পাইয়া চুপ করিয়া গেলাম। কথা বাড়াইতে সাহস হইল না। তিনি বলিলেন, মেয়েটি এতদিনে ত' বড় হয়েছে। বোধ হয় বিয়ে হয়নি, কি বলো?

ঠিক বলতে পারিনে।

বোধ হয় হয়নি, কারণ নিন্দেটা ওদের পেছনে কুকুরের মতন ছিল কিনা।

বলিলাম, নিন্দেটা ত' মিথ্যে নয়, বাবা।

বাবা বলিলেন, অনেক নিন্দেরও আবার মহিমা আছে, রাজেন।

তবে আপনি নিজের হাতে ঘর জ্বালাতে গেলেন কেন?

তাদের ঘর জ্বলেছিল, তাই তোমার মায়ের ঘর রক্ষা হয়েছে। অবশ্য ক্ষতিপূরণ আমি করবার চেষ্টা করেছি।

বলিলাম, বুঝতে পারলুম না, বাবা।

এর বেশি আর কিছু বোঝবার নেই।

বাবাকে ঔষধ খাওয়াইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলাম। মৃন্ময়ীর শেষ মন্তব্যটা আমার কানে আবার যেন নূতন করিয়া বাজিল, বড়লোকের আবার মনুষ্যত্ব! বাল্যকালে আমাদের হাতে তারা মার খাইয়াছে, ধনী ও দরিদ্রের ভিতরকার সম্পর্কটাকে বিষাক্ত করিয়াই ভাবিয়া রাখিয়াছে, যতদিন মৃন্ময়ী বাঁচিবে ততদিনই সে এই কথাটা ঘোষণা করিয়া বেড়াইবে যে, যাহারা ধনী তাহাদের খেয়াল আছে, মেজাজ আছে, কিন্তু মনুষ্যত্ব নাই। সংস্কার স্বভাবে দাঁড়াইয়াছে, সুতরাং আমার আচরণে সে হয়ত খেয়াল ও লোভকেই লক্ষ্য করিয়াছে, কিন্তু প্রাণের স্পর্শ খুঁজিয়া পায় নাই।

আমার মনোবিকার আমি সংযত করিতে পারিলাম না। আলমারীর বইগুলির দিকে চাহিয়া ভাবিলাম, উহারা যেন অতীতকালের শত সহস্র অন্যায় ও উৎপীড়নের ইতিহাস বুকে লইয়া মুখ বুজিয়া আছে। একটা অন্ধ, অবরুদ্ধ, নিগূঢ় প্রশ্ন যেন ওই গ্রন্থগুলি হইতে বাহির হইয়া আমার চারিপাশে বীভৎস মূর্তি লইয়া দাঁড়াইল। আমার নিজ জীবনের চেহারাটা একটা যেন বিলোল লালসা ও সম্ভোগবাসনার পুঞ্জীভূত স্তূপ। ক্ষুধার খাদ্য যোগাইয়া ক্ষুধাকেই জাগাইয়াছি, প্রবৃত্তি ও দুরন্তপনার তরঙ্গে ভাসিয়া অকুণ্ঠ আত্মপরতাকে প্রাধান্য দিয়া আমি

যেখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি তাহা আমারই একটা নিজস্ব জগৎ, তাহার হালচাল আমিই জানি, আর কাহারও সহিত না মিলিলেও আমি একটা বিশেষ আনন্দের মধ্যে বাঁচিয়া থাকি। কিন্তু আজ পিতামাতার অন্যায়ের গুরুভার সহসা উৎক্ষিপ্ত হইয়া আসিয়া যেন আমার উপরেই চাপিয়া বসিল। আমার বাল্যকালে যাহা আমার অজ্ঞানে ঘটিয়াছিল, যাহা আমার স্মৃতির চতুঃসীমার মধ্যে কোনও দাগ কাটিয়া রাখে নাই, আজ যেন কবরের মাটি ফুঁড়িয়া সেই দুষ্কর্মের কলঙ্কটা বাহির হইয়া ভয় দেখাইতে লাগিল। পিতার আলাপের মধ্যে আমি সন্তোষ-জনক কৈফিয়ৎ খুঁজিয়া পাই নাই, শুধু পাইলাম একটা স্বেচ্ছাকৃত বর্বর অহেতুক উৎপীড়নের কাহিনী—যাহার কোনও সুস্পষ্ট যুক্তি নাই, নীতি নাই, প্রয়োজন নাই।

কলিকাতা শহরে আমি তাহাকে কোথায় খুঁজিয়া বাহির করিব? যাহাদের জীবন ও স্থিতির মূল আমরা নষ্ট করিয়া পথে বসাইয়াছি, তাহারা পথে পথেই বাসা বাঁধিয়াছে—আজও সেই মেয়ে কলিকাতার শাখাপ্রশাখা-বহুল পথের রহস্যে ভাসিয়া গিয়াছে, আমি কোথায় গিয়া তাহার সন্ধান করিব? কোনও চিহ্ন, প্রাণের কোনও নিশানা, বন্ধুতার কোনও আভাস —এমন কিছুই নাই যাহার রেখা অনুসরণ করিয়া মৃন্ময়ীকে গিয়া গ্রেপ্তার করিব। আর কিছু নয়, কেবল এই কথাটা

জানাইয়া দিতে বাসনা হইল, আমি নিজে লোভী ও আত্মপর হইতে পারি, কিন্তু তোমাদের উপর উৎপীড়ন যাহারা করিয়াছে আমি তাহাদের পুত্র হইলেও এই আদিম বর্বরতা আমি সমর্থন করিব না।

পৃথিবীতে যাহারা চিরকাল ধনী বলিয়া পরিচিত হয়, তাহারা চিরকাল ধরিয়াই গরীবের বুকের উপর দিয়া তাহাদের খেয়াল ও স্বেচ্ছাচারের রথ চালাইয়া আসিয়াছে, কিন্তু আমিও যে তাহাদেরই একজন প্রতিনিধি, মৃন্ময়ী এই কথাটা জানিয়া গেল,—কি উপায়ে ইহার প্রতিবিধান করিব? তাহার ন্যায় তরুণী আমি অনেক দেখিব, অনেক কাল ধরিয়া অনেককেই ভালবাসার দিক্‌ হইতে প্রতারিত করিব, প্রয়োজন হইলে তাহাদের পরিচ্ছন্ন জীবনকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিতেও পশ্চাৎপদ হইব না, কিন্তু এই অপবাদ কিছুতেই সহ্য করিব না যে, বড়লোক মাত্রই মনুষ্যত্বহীন, অহেতুক অত্যাচার করাই তাহাদের পেশা, গরীবের অক্ষমতার সুযোগ লইয়া ঘর জ্বালাইয়া দেওয়াতেই তাহাদের আনন্দ!

পিতার রোগের দুর্ভাবনা ও আমার এই মনোবিকার লইয়া আমি যখন বিক্ষুব্ধভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম, তখন একদিন সহসা পটপরিবর্তন ঘটিল।

সন্ধ্যার সময়ে কোনও কালেই বাড়ীতে ঢুকি না, ইহা আমার

অভ্যাস নাই। চরিত্রকে গোপন রাখিয়া ও কৈফিয়ৎ বাঁচাইয়া অনেক রাত্রেই বাড়ী আসিয়া পৌঁছাই। কিন্তু পিতৃদেবতার অসুখের জন্য চরিত্র রক্ষা করিয়া সেদিন সন্ধ্যার সময়ে বাড়ী ঢুকিতেছিলাম, দেখিলাম একটি যুবক আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। কিছু নেশা করিয়াছিলাম, সেই কারণে চোখ-মুখের চেহারা সহজ ছিল না, প্রাণের ভিতরে কিছু রাজসিক উল্লাস সঞ্চিত হইয়াছিল।

ছোকরা আমাকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। নমস্কার করিয়া কহিল, আপনার জন্যই অপেক্ষা করেছিলাম।

কে আপনি ?

আমার নাম শ্যামাকান্ত ভট্টশালী।

কি চাই বলুন ?

আপনাকে আমার সঙ্গে একটু যেতে হবে।

চোখ রগড়াইয়া মুখের গন্ধ চাপিয়া তাহার আপাদ-মস্তক লক্ষ্য করিলাম। পরে বলিলাম, কোথা থেকে আসছেন আপনি ? কোথায় যাবো ?

শ্যামাকান্ত কহিল, আমাকে চিনতে পারলেন না ?

বলিলাম, সম্পূর্ণ অপরিচিত আপনি।

সে কহিল, হারিকেনের আলোয় দেখেছিলেন, ইলেক্‌ট্রিকের আলোয় তাই মনে পড়ছে না।

বলিলাম, পূর্বজন্মেও আপনাকে আমি দেখিনি।

ছোকরা আমার কথায় হাসিমুখে বলিল, সরোজিনী দেবীর মৃত্যুর দিনে আমরা ঘরে ছিলুম, আপনি দেখেন নি ?

ও,—স্যরি ! কি চাই আপনার ?

দিদি একবার আপনাকে ডাকছেন।

ছলনাময় বৈরাগ্য প্রকাশ করিয়া কহিলাম, দিদি কে ?

মৃন্ময়ী।

পুনরায় শ্যামাকান্তের মাথা হইতে পা অবধি লক্ষ্য করিলাম। বলিলাম, তিনি কি আপনার সহোদরা ভগ্নী ?

আজ্ঞে না।

তবে কি অতি-আধুনিক দিদি ?

কথাটা বোধ হয় শ্যামাকান্ত বুঝিল না, বলিল, যদি একটু তাড়াতাড়ি আসেন ত' ভাল হয়, তিনি রাস্তায় অপেক্ষা করছেন।

ভিতরে ভিতরে অসীম উল্লাস বোধ করিলাম, বাহিরে গাম্ভীর্য রক্ষা করিয়া কহিলাম, কি দরকার আপনি জানেন ?

আমি ঠিক জানিনে, তাঁর কাছেই শুনবেন।

তবে একটু অপেক্ষা করুন, আসছি—বলিয়া আমি ভিতরে গেলাম। উপরের ঘরে গিয়া আয়নার কাছে দাঁড়াইয়া চুল ফিরাইলাম। শরীরটা ঠিক নিজের আয়ত্তে নাই, মাথার

ভিতরটা একটু মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। বলা বাহুল্য, মৃন্ময়ীর পূর্ব আচরণ দেখিয়া একটু সম্ভ্রম করিয়াছি, এইভাবে তাহার নিকট গিয়া দাঁড়াইতে কেমন যেন ভরসা পাইলাম না। কিন্তু এখন আর উপায় নাই ; যাহাকে সমস্ত প্রাণ দিয়া কামনা করিয়াছি, সে দরজায় আসিয়া উপস্থিত। পৈতৃক দুষ্কর্মের প্রায়শ্চিত্ত না করিতে পারি, কিন্তু পিতামাতার হইয়া অবশ্যই ক্ষমা চাহিতে পারিব। তাহার পর তাহাকে ভালবাসিয়া অতীত স্মৃতি মন হইতে মুছিয়া দিতে পারিব।

কয়েকটা এলাচ মুখে পুরিয়া নীচে নামিয়া আসিলাম। শ্যামাকান্ত বাহিরে দাঁড়াইয়াছিল, তাহাকে সঙ্গে লইয়া পথে বাহির হইয়া পড়িলাম।

গোয়াবাগান হইতে বাহির হইয়া বীডন স্ট্রীট দিয়া আসিয়া হেদুয়ার কোণে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, মৃন্ময়ী সেখানে দাঁড়াইয়া এদিকে ওদিকে লক্ষ্য করিতেছে। আমি কাছে গিয়া দাঁড়াইলাম। সে নমস্কার করিল না, অভ্যর্থনা জানাইল না, কেবল শ্যামাকান্তকে বলিল, তুমি আর দাঁড়িয়ো না নীরেন, চলে যাও। আনা দুই পয়সা দিন্ ত' ওকে ?

আমি স্তম্ভিত হইয়া পকেট হইতে দুই আনা বাহির করিয়া দিলাম। শ্যামাকান্ত চলিয়া গেল। তারপর বলিলাম, এ যেন একটা ভেল্‌কি। ও যে বললে ওর নাম শ্যামাকান্ত ভট্টশালী ?

মৃন্ময়ী হাসিমুখে বলিল, শিখিয়ে দিয়েছিলুম।

বলিলাম, তোমাদের সঙ্গে মিশতে গিয়ে দেখছি কোন্ দিন আমিও পুলিশে ধরা পড়বো।

ভয় নেই, পুলিশ মানুষ চেনে। আসুন এদিকে যাই।

চলিতে চলিতে বলিলাম, হঠাৎ এই মনুষ্যত্বহীন বড়লোক-টিকে স্মরণ করলে কেন মৃন্ময়ি ?

বড়লোককে স্মরণ না করলে আমরা যাই কোথা ?

ঠিকানা জানলে কি ক'রে ?

আপনাদের ঠিকানা ছোটবেলা থেকেই জানি।

আমি সবিস্ময়ে তাহার মুখের দিকে চাহিলাম, সে পুনরায় কহিল, আপনার বাবার ত' খুব অসুখ, নয় ?

বলিলাম, কেমন ক'রে জানলে ?

মৃন্ময়ী হাসিল। বলিল, আপনি আজ বিকেলে ধর্মতলার হোটেলে ঢুকেছিলেন কেন ?

আমি ভয় পাইয়া মাথা নীচু করিলাম। মৃন্ময়ী চলিতে চলিতে বলিল, শ্যামাকান্ত ভট্টশালী আর হরিহর মোদককে রেখেছি আপনার পেছনে পেছনে।

বলিলাম, তোমার কি উদ্দেশ্য, মৃন্ময়ি ?

সত্যি বল্‌ব ?—মৃন্ময়ী বলিল, আপনাকে এই নীতি শিক্ষা

দেওয়া যে, বড়লোকের ছেলে ব'লেই টাকা নষ্ট করার অধিকার আপনার নেই।

এইবার হাসিলাম। বলিলাম, এই কথা শোনাবার জন্য বুঝি এত দূর এসেছ ?

হ্যাঁ, আজ সারাদিনে অন্তত দশ মাইল হেঁটেছি, দু'দিন আমাদের অন্ন জোটেনি, কারণ পয়সা নেই।

বলিলাম, তাহ'লে বড়লোকের মনুষ্যত্ব তোমরা তখনই স্বীকার করতে পারো, যখন তারা টাকা দিতে পারে ?

মৃন্ময়ী বলিল, না, রাজেনবাবু। মনুষ্যত্ব তাদের কোনোদিনই নেই—নেই বংশপরম্পরায়। আমরা তাদের মনুষ্যত্বের শিক্ষা দিয়ে সম্মান-মূল্য আদায় করি।

কে তোমরা ?

আমরা দেশের ভবিষ্যৎ নিয়মকর্তা।

বলিলাম, কিন্তু নিধিরাম সর্দারদের ঢাল তরোয়াল কই ?

আছে, যথাসময়ে আপনাদের ঘাড়ে পড়বে—বলিয়া মৃন্ময়ী হাসিল।

এই বুঝি তোমাদের বিপ্লবের আদর্শ? আমাকে ডেকে এনে এই কথাই প্রচার করতে চাও ?

না,—মৃন্ময়ী বলিল, তার চেয়ে বড় কাজ আপনাকে দেবো।

যথা ?

স্বার্থত্যাগের মহৎ ব্রত।

আমি চলিতে চলিতে মৃন্ময়ীর দিকে এইবার একবার ভাল করিয়া চাহিলাম। সত্য বলিব, মাতৃবিয়োগের শোক ও সেই সেদিনকার গভীর দুশ্চিন্তার সুগভীর কালো ছায়া তাহার মুখের উপর হইতে সরিয়া গিয়াছে। সারাদিনের পথশ্রম ও ক্লিষ্টতা তাহার টসটসে তরুণ মুখশ্রীকে যেন সুন্দর করিয়াছে। ভাঙা চুলের গোছা তাহার মুখে চোখে ; আভরণ কোথাও কিছু নাই ; সামান্য জামা, সামান্য শাড়ী, কিন্তু প্রচুর স্বাস্থ্যের উপকরণ সর্বাঙ্গে থরে থরে সাজানো। আমি মনে মনে লুব্ধ হইয়া উঠিলাম। আশান্বিত হইলাম।

মৃন্ময়ী কহিল, কি, চুপ ক'রে রইলেন যে ?

ভাবছি ছোটবেলাকার কথা, তুমি সেই শিবের গাজন গাওয়া মেয়ে, এখন বিপ্লবীদলের দিদি। একটা কথা কিন্তু আমার জানতে ইচ্ছে ক'রে, মীনু।

বলুন ?

তোমাকে এমন বোকা বানালে কে ?

আপনাদের মতন বড়লোকেরা।

কিন্তু তাদের ওপর রাগ ক'রে এমন জীবনটা নষ্ট করবে ?

মৃন্ময়ী প্রশ্ন করিল, নষ্ট আপনি কা'কে বলেন ?

লুব্ধ, উজ্জ্বল, একাগ্র দৃষ্টিতে তাহার দিকে ফিরিয়া বলিলাম, এই সবই কি তোমার কাজ!

আমার কণ্ঠে বোধ হয় মধু-র আস্বাদ ছিল ; পথের নির্জনতা হয়ত আমাকে অল্পে অল্পে মোহগ্রস্ত করিতেছিল। রাত্রির কলিকাতার পথের আলোছায়া মৃন্ময়ীর ললাটে, গ্রীবায়, বক্ষে কী যে মায়া বুলাইল তাহা বলিতে পারিব না। আমি কেবল মাত্র একটি ইঙ্গিতের অপেক্ষা করিতেছিলাম, এবং সেটি পাইলেই শ্যেনপক্ষীর ন্যায় তাহাকে তুলিয়া লইয়া নিরুদ্দেশ শূন্যে এমন ভাসিয়া যাইতাম যে, পিতার অসুখ, আমার কর্তব্য, বাড়ী ফিরিবার কথা, মৃন্ময়ীর পরিণাম,—কিছুই চিন্তা করিতাম না।

নিজের কণ্ঠে পুনরায় মধু ঢালিয়া বলিলাম, মৃন্ময়ি, এ তোমার ঠিক পথ নয়, তা' তুমি জানো?

মৃন্ময়ীর নীরবতা সহসা বিদীর্ণ হইল। সে একটু সরিয়া গিয়া বলিল, রাজেনবাবু, আপনার নিজের পথটা কি? নেশায় টল্‌টল্ করছেন, একজন মেয়ে এসেছে সাহায্য চাইতে, তাকে কি ভাবে অপমান করবেন তারই ফন্দি আঁটছেন মনে মনে; আপনার বাবার অত বড় অসুখ, সেদিকে আপনার ভ্রূক্ষেপ নেই; আমরা উপবাস ক'রে রয়েছি দু'দিন, আপনি গ্রাহ্য করলেন না—

আমি থমকিয়া দাঁড়াইলাম।

মৃন্ময়ী পুনরায় কহিল, আমি এলুম আপনার কাছে ভিক্ষে চাইতে, মিনতি জানাতে; এলুম আমার ছোট ভাইবোনদের অন্নবস্ত্র চেয়ে নিতে,—আর আপনি আমাকে পথ ভুলিয়ে দিতে চান্। আপনার পথটা কি এই?

আমার নেশা কাটিয়া গেল, পুনরায় ধীরে ধীরে চলিতে চলিতে বলিলাম, দেশে এত বড়লোক থাকতে আমার মতন লোকের কাছে সাহায্য চাওয়ার রহস্য কি?

রহস্য কিছু নয়।—মৃন্ময়ী বলিল, টাকা অপব্যয় যারা করে, তারা সদ্ব্যয়ও কিছু করে বৈকি। আপনি ত' কৃপণ নন্।

একখানা খালি ফীটন্ গাড়ী দেখিয়া ডাকিলাম। মৃন্ময়ীকে বলিলাম, ওঠো।

ইতস্তত করিয়া সে বলিল, অনেক ভাড়া নেবে যে?

তা হোক, এসো।

সে উঠিয়া বসিল। আমি তাহার পাশে বসিলাম। সে কহিল, এ সব ছাই খান্ কেন? এলাচের গন্ধে আপনার মুখের দুর্গন্ধ ঢাকা পড়েনি।

বলিলাম, আর লজ্জা দিয়ো না, কোন্ দিকে যাবে ব'লে দাও।

মৃন্ময়ী কহিল, একটা সর্তে কিন্তু আপনার সঙ্গে গাড়ীতে উঠলুম ব'লে রাখছি।

সর্তটা কি?

আমাকে অনেক টাকা দেবেন।

অনেক টাকা তোমার কি হবে?

অনেক দরকার।

আমার স্বার্থ?

মৃন্ময়ী বলিল, যে-টাকা আপনি জুয়া খেলেন, যে-টাকা আপনি সিনেমা আর থিয়েটারের গ্রীনরুমে খরচ করেন, যে-টাকা নেশায় দেন্, সেই টাকাটা দিন দরিদ্রদের।

বলিলাম, দরিদ্রদের? পঁয়ত্রিশ কোটির জন্যে নিজের আনন্দ মাটি করব?

আপনার জীবনের লক্ষ্য কি?

আমার জীবনের লক্ষ্য এই নয় যে, জনকয়েক অক্ষম বেকার ভবঘুরের জন্যে সর্বস্বান্ত হবো!

মৃন্ময়ীর গলার আওয়াজ যেন একটু ভারি হইয়া উঠিল। বলিল, আর যারা কোনো ভাল কাজের জন্যে জীবন পাত করে, তাদের জন্যে একটু স্বার্থত্যাগ করা যায় না?

ভাল কাজ?—হাসিয়া উঠিলাম,—এর কি কোনো বাঁধা-ধরা হিসাব আছে? ভাল কাজ করার চেয়ে ভাল ক'রে বাঁচাটা

অনেক বেশি দামি, মৃন্ময়ি। এই ধরো তোমার জীবন, তুমি কল্যাণ ক'রে গেলে পরের জন্য, তোমার দিকে চাইলে কে? তুমি পেলে যশ, পেলে প্রতিষ্ঠা, পেলে হাততালি—কিন্তু বুকের ভেতরকার মরুভূমি হা হা ক'রে ত' জ্বলতেই থাকলো। বড় আদর্শের জন্যে তুমি সারাজীবন ধ'রে তিলে তিলে—

আমি বোধ করি আরও বক্তৃতা দিতাম, কিন্তু মৃন্ময়ী গাড়োয়ানকে বলিয়া গাড়ী থামাইল। বলিল, আসুন, আমাকে কিছু বাজার ক'রে দেবেন। আঃ, কী বক্‌তেই পারেন আপনি।

তাহার সেই অদৃশ্য অপোগণ্ড সখের ভাইগুলার উপর অসীম বিরক্তি ও আক্রোশ লইয়া গাড়ী হইতে নামিলাম এবং আধঘণ্টা ধরিয়া কয়েকটা টাকা খরচ করিয়া জীবনেও যাহা করি নাই, সেই দোকান-বাজার ঘাড়ে করিয়া গাড়ীতে চাপাইয়া আবার গাড়োয়ানকে চালাইতে বলিলাম। গাড়ী দক্ষিণ দিকে চলিতে লাগিল, আমি মেঘমলিন মুখে গুম হইয়া বসিয়া রহিলাম। আসল প্রাপ্তির কথাটা এখনও চাপা পড়িয়া আছে ভাবিয়া রাগ হইতে লাগিল। স্ত্রীলোকের অনুগ্রহলাভের জন্য জীবনে অনেক সহ্য করিয়াছি, ইহাও সহ্য হইবে। দেখিতেছি ইহার শাখা-প্রশাখা অনেক দূর অবধি বিস্তৃত, সমস্ত শিকড়গুলি একে একে উৎপাটন করিতে কিছু বিলম্ব ঘটিতে পারে; ধৈর্য হারাইলে চলিবে না। দুই দিক্ হইতে দুইটা অসুবিধা আমাকে

সংযত করিয়া রাখিয়াছে। প্রথমত, মেয়েটার সহিত আমার আবাল্য পরিচয়, অর্থাৎ অসভ্যতা প্রকাশ করিতে একটু বাধে; দ্বিতীয়ত, ভাল রকম লেখাপড়া জানে, চিত্তদৌর্বল্যের অন্ধি-সন্ধিগুলা বড় তাড়াতাড়ি ধরিয়া ফেলে; পাকা পাকা কথা বলে। মিষ্টি করিয়া দু'কথায় ভুলাইয়া প্রশ্রয় পাইবার উপায় নাই। টাকাপয়সাগুলা কোন্ অতলে তলাইতেছে কে জানে!

আমি তাহাকে পথ ভুলাইতে গিয়া নিজে পথ ভুলিয়াছিলাম, কিন্তু মৃন্ময়ী পথ ভুল করে নাই। আমার চোখে মুখে যে-পরিমাণ আবেশ-পুলক সঞ্চারিত হইয়াছিল তাহার ছিল সেই পরিমাণ উৎকণ্ঠা। আমার চোখ ছিল তাহার প্রতি, তাহার দৃষ্টি ছিল পথ ফুরাইবার দিকে। এতগুলি কথা এতক্ষণ ধরিয়া যে তাহাকে বলিলাম, তাহা যে কেবল তাহার মনে কোনো আঁচড় কাটে নাই তাহাই নহে, সে গ্রাহ্যই করে নাই। স্বধু পরাজিত এবং উপেক্ষিত নহে, আমি যেন পুনরায় অপমানিত বোধ করিলাম।

এক সময়ে সে গাড়ী থামাইল। বলিল, এইখানে নামতে হবে।

এতক্ষণে চমক ভাঙিল। পল্লীটার দিকে চাহিয়া সহসা ভয় পাইলাম। চারিদিকে বস্তি, ভদ্রসমাজ কোথাও নাই। কুলী, মজুর, কলকারখানা, বিড়ির দোকান, পতিতালয়, বাজার

এবং চারিদিকে কুৎসিত হট্টগোল। বলিলাম, কোথায় থাক তোমরা ?

এই সামনের গলিতে।—মৃন্ময়ী পিছন ফিরিয়া দেখাইল।

অন্ধকার গলিটার দিকে চাহিয়া কিছুই বুঝিলাম না, কেবল বুঝিলাম সেই সুড়ঙ্গপথে জন্তু-জানোয়ারের আনাগোনাই বেশি মানায়। মৃন্ময়ী সহিসকে দিয়া জিনিষপত্রগুলি নামাইয়া লইল এবং আমাকে ইতস্তত করিতে দেখিয়া বলিল, শিগ্‌গির নেমে আসুন, এটা গাড়ী দাঁড়াবার জায়গা নয়।

বলিলাম, আমার যাবার কি দরকার ?

সে বলিল, যারা এখানে আছে তারা আভিজাত্যে কম নয় আপনার চেয়ে, রাজেনবাবু।

মার খাইয়া, গাড়ী ভাড়া দিয়া তাহার পিছনে পিছনে চলিলাম। অর্থাৎ ব্যাপারটা এই দাঁড়াইল, চাবুকের শব্দ না করিলে আমাকে দিয়া কোনো কাজ পাওয়া যাইবে না। তাহার সহিত আসিয়া যেখানে দাঁড়াইলাম, তাহা একটা ভৌতিক রাজ্য। গাড়ীর সেই সহিসটা আন্দাজে ঠাহর করিয়া মাথা হইতে জিনিষপত্র নামাইয়া রাখিয়া চলিয়া গেল। আমার মনে হইল—কলিকাতা শহর হইতে শত সহস্র মাইল নির্বাসনে আসিয়া পড়িয়াছি ; কেহ বাহির করিয়া না দিলে, আর এই গোলকধাঁধা হইতে বাহির হইতে পারিব না। মৃন্ময়ী আমাকে

দাঁড় করাইয়া কোথায় যে মিশাইয়া গেল বুঝিতে পারিলাম না, মনে হইল গাড়ীখানা ছাড়িয়া দিয়া ভাল করি নাই। একবার উপর দিকে চাহিয়া একটুখানি আকাশ দেখিতে পাইলাম। যাহা সন্ধ্যা হইতে লক্ষ্য করি নাই, তাহাই এতক্ষণে চোখে পড়িল। দেখিলাম ফিকা একটুখানি জ্যোৎস্নার আভাস কায়ক্লেশে এই খোলার চালের ভিতর দিয়া উঠানে আসিয়া পড়িয়াছে। পাশেই জলের ধারা বহিতেছিল, সেই জল প্রেতিনীর চক্ষুর ন্যায় আমার দিকে মাঝে মাঝে কটাক্ষ হানিতেছিল। আমি নিরুপায় স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

অনেকক্ষণ পরে আলোর রেখা দেখা গেল। মৃন্ময়ী বাহির হইয়া আসিল। কাছে আসিয়া চুপি চুপি কহিল, কারো পায়ের শব্দ পাননি ত' ?

বলিলাম, পায়ের শব্দ! কা'র ?

কত লোক আসে। দুষ্ট লোক বরং ভাল, কিন্তু ভদ্রলোকেরা বড়ই সন্দেহজনক। আমরা এখানে প্রাণ হাতে ক'রে থাকি।

গা ছম-ছম করিয়া উঠিল। ঢোক গিলিয়া বলিলাম, পুলিশের কথা বল্‌ছ ?

মৃন্ময়ী অদ্ভুত হাসি হাসিল। বলিল, বস্তির মেয়েমানুষকে কেউ সন্দেহ করে না। আসুন।—বলিয়া আলোটা হাতে করিয়া সে অগ্রসর হইল।

মানুষের সাড়াশব্দ কোথাও নাই, আমাকে লইয়া মৃন্ময়ী কি উদ্দেশ্য সাধন করিবে তাহাও জানি না, কিন্তু মাটির দাওয়ার উপর গা বাঁচাইয়া তাহাকে অনুসরণ করিয়া একটি কুঠুরীতে আসিয়া ঢুকিলাম। উঁচু-নীচু মাটির উপর খবরের কাগজ ও দরমা পাতিয়া শয্যা প্রস্তুত করা এবং সমস্ত ঘরে ছোট্ট একটি স্যুটকেস ছাড়া আর কোথাও কোনো আসবাব নাই। আমি এই প্রেতপুরীর ভিতরে ঢুকিয়া রুদ্ধনিঃশ্বাসে বলিলাম, এইটি বুঝি তোমার ঘর, মীনু ?

হ্যাঁ, বসুন। এখানে আদরও নেই, অবহেলাও নেই।

দুই জনেই বসিলাম।

বলিলাম, তুমি একা থাকো এখানে ?

একা !—মৃন্ময়ী বলিল, আট ভাইবোন আছি পাশাপাশি ঘরে। ডাকবো তাদের ? ওরা নিঃসাড়ে প'ড়ে আছে। আপনি যে নতুন মানুষ। অপরিচিত কেউ এলে ওরা গা ঢাকা দেয়।

ওরা কি করে ?

কিছুই করে না, সুধু লুকিয়ে থাকে নাম ভাঁড়িয়ে। কিন্তু দুর্ভাগ্যটা কি জানেন। ভাইরা যখন থাকে না, অনেক মাতাল আসে,—মনে করে এটা বেশ্যালয়।

আমি শিহরিয়া উঠিলাম। বলিলাম, সম্মান গেলে জীবনে আর থাকে কি, মৃন্ময়ী ?

মৃন্ময়ী বলিল, সম্মান লোক কেড়ে নিতে পারে না, রাজেন-বাবু, নিজের সম্মান থাকে নিজেরই মধ্যে। প্রবলের কাছে মহতের অপমান খুবই সহজ, কিন্তু তাই ব'লে মহৎ আপন মহিমা হারায় না।

জীবনে যে-প্রশ্ন আমার ন্যায় অধঃপতিতদের মুখে কোন-দিনই আসে নাই, আজ এই রাত্রির অন্ধকারে স্তিমিত প্রদীপ-শিখার আলোয় বসিয়া মৃন্ময়ীর অপরিসীম যৌবনের দিকে চাহিয়া সেই প্রশ্নই আমার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল। বলিলাম, কিন্তু নারীধর্ম রক্ষার একটা কথা থাকে ত'? অর্থাৎ বলপূর্বক যদি কেউ—

মৃন্ময়ী বলিল, আপনি যদি অত্যাচার করেন আপনিই ছোট হবেন, আমার কোনো ক্ষতি হবে না।

হঠাৎ হাসিয়া বলিলাম, হবে না? বলো কি?

সহসা যেন বাঘিনীর চোখ জ্বলিয়া উঠিল, বলিল, না, সেই ক্ষতি আমাকে স্পর্শও করবে না।

অনেকক্ষণ পরে বলিলাম, তবু একটা কথা যাবার সময় আমি ব'লে যাবো, আমাকে ক্ষমা ক'রো মীনু। গায়ে পড়া কোনো উপদেশ তোমাকে দিয়ে যেতে আর আমার সাহস নেই, কারণ আমাদের রুচি আর আদর্শ সম্পূর্ণ আলাদা। আমি বলছি আমাদের বাল্য পরিচয়ের অধিকার নিয়ে, আমরা সেই

হু'টি উলঙ্গ বালক বালিকা গ্রামের পথে শিবের গাজন গেয়ে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াতুম—আকাশ আর বাতাস আর সোনার ধানক্ষেত আমাদের কানে কানে কত কি কথা শোনাতো ; সেইদিনকার সেই বাল্যস্মৃতির অধিকার নিয়ে জানতে চাইছি, এই অভিশপ্ত, পলাতক, দরিদ্র আর হতমান জীবন কি তোমার ভাল লাগে ?

লাগে।—মৃন্ময়ী বলিল।

কেন—কেন লাগে ? বলবে আমাকে ?

অনুপ্রাণিত কণ্ঠে মৃন্ময়ী বলিতে লাগিল, সেই সোনার ধানক্ষেত আমার দেশ নয়, রাজেনবাবু। এইখানে এ যন্ত্রণার মাঝখানে, এই দারিদ্র্য আর অপমান, এই উৎপীড়ন আর পাশবিকতা—এর মাঝখানে খুঁজে বার করতে পারছি আমার সোনার দেশের হৃৎপিণ্ড। উপবাসে আর যক্ষ্মায় যারা ধুঁকছে, আপন জীবনের ভিত্তিকে যারা বিষাক্ত করে তুলছে, যারা পাপ আর অন্যায় আর দুষ্কৃতিকেই ধর্ম ব'লে মেনেছে—সেই সব মূঢ় পশু পঙ্গু আর বিকলাঙ্গদের নিয়ে আমি ঘর বেঁধেছি। আমিও সেই অভিশপ্ত দলের সঙ্গে এই প্রকাণ্ড প্রশ্নের সমাধান করতে চাই, পৃথিবীতে একদল কেন স্ফীত, আর একদল কেন কৃশ ! একদল কেন হবে অন্নদাতা, আর একদল কেন বা অন্নহীন ! সোনার ধানক্ষেত নয়, রাজেনবাবু, আমার ভাইবোনদের সঙ্গে

এই কাজেই আমি নেমেছি। আপনি আমাদের সাহায্য করবেন কিনা বলুন।

বলিলাম, আমি পুলিশকে অত্যন্ত ভয় করি, কারণ এদেশের পুলিশ ভয়ঙ্কর। তোমাদের বে-আইনী সাহায্য করব কেন?

মৃন্ময়ী বলিল, যদি বলি মনুষ্যত্বের আইনে?

তুমিই ত বলেছ—বড়লোকদের মনুষ্যত্ব নেই!

তাহ'লে আপনারা যে আমাদের ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন, তারই না হয় ক্ষতিপূরণ করুন?

বলিলাম, পিতার অপরাধে পুত্রের প্রতি দণ্ড?

মৃন্ময়ী সহসা চুপ করিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল। পরে নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, আপনি বোধ হয় জানেন না যে, আপনার বাবার কোনো অপরাধ নেই।

সান্ত্বনা দিয়ো না, মৃন্ময়ী।

সত্যিই বলছি।

উত্তেজিত হইয়া বলিলাম, যিনি স্বহস্তে তোমাদের ঘরে আগুন ধরিয়ে দিলেন তাঁকে অপরাধী বলবে না? তোমরা মা-মেয়ে সংসারে কত ছলনাই জানতে।

আমার আকস্মিক অসংযত মন্তব্য শুনিয়া স্খলিতবস্ত্রে মৃন্ময়ী সহসা উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং সটান গিয়া ঘরের কোণ হইতে ছোট সুটকেসটা আনিয়া খুলিল। ভিতরে ছোট একটা

কাপড়ের মোড়ক ছিল, সেটি খুলিয়া অতি পুরাতন একখানি বাংলা ভাষায় লেখা পত্র ধীরে ধীরে খুলিয়া আমাকে দেখাইয়া বলিল, ভাল ক'রে দেখুন ত, হাতের লেখাটা কা'র চিনতে পারেন ?—এই বলিয়া সে আলোটা উজ্জ্বল করিয়া দিল।

অনেকক্ষণ পরীক্ষা করিয়া স্খলিত কম্পিত কণ্ঠে কহিলাম, আমার বাবার হাতের লেখা—

এবার সবটা পড়ুন,—মৃন্ময়ী দৃঢ়কণ্ঠে আদেশ করিল।

"সরোজিনী, তোমার ঘর পোড়াইলাম, তাহার কারণ তোমার ও আমার ভিতরকার সম্পর্ক বর্তমান সমাজ এবং আমার স্ত্রী স্বীকার করিল না। তোমার ইহজীবনের সমস্ত ভার আমি গোপনে বহন করিব। তোমার কন্যার বিবাহের জন্য তোমার নামে ব্যাঙ্কে টাকা জমা দিলাম।

ইতি—তোমার ব্রজেন্দ্র"

স্তব্ধ বিমূঢ় হইয়া মৃন্ময়ীর মুখের দিকে চাহিলাম। মৃন্ময়ী চিঠি লইয়া স্যুটকেসে রাখিয়া সেটি পুনরায় তুলিয়া আসিল। তারপর ডাকিল, রাজেনবাবু ?

সাড়া দিতে পারিলাম না।

শুনছেন ? চিঠি দেখানো কি অন্যায় হ'ল ?

মুখ তুলিলাম। সে কহিল, আবার আসছেন ত' ?

ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইলাম। তারপর বুকপকেট

হইতে মনিব্যাগটা বাহির করিয়া তাহার দিকে ফেলিয়া দিলাম। সে একটু চিন্তিত হইয়া আমার দিকে একবার চাহিল, তারপর মনিব্যাগটা তুলিয়া কয়েকটা টাকা বাহির করিয়া লইয়া পুনরায় ব্যাগটা আমার বুকপকেটে রাখিয়া দিল।

বোধ করি আমার উঠিবার শক্তি ছিল না, হাত পা সত্যই অবশ হইয়া গিয়াছিল। মৃন্ময়ী বুঝিতে পারিয়া আমাকে ধরিয়া তুলিল, এবং হাত ধরিয়া সন্তর্পণে বাহিরে আনিয়া গলির মুখে গিয়া বলিল, এরপর যেন বাবুকে আর খুঁজে আনতে না হয়।

আমি তাহার কথার উত্তর দিলাম না, কেবল আমার পিতা-মাতার হইয়া তাহার তথাকথিত কলঙ্কবতী মৃতা জননীর নিকট বারম্বার ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। সমস্ত পথটা ধীরে ধীরে হাঁটিয়া চলিলাম। আকাশে ঘন মেঘ করিয়াছে ; টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল।

৪

সহসা আমাদের পারিবারিক জীবন ভয়ে কণ্টকিত হইয়া উঠিল। গত তিনদিন হইতে বাবার অসুখ যেন দ্রুত এক বিপদের সীমারেখার দিকে চলিয়াছে, আমাদের সমস্ত সংসারটা অস্বস্তিতে আলোড়িত হইল।

পিসিমা আসিলেন, বাবার এক অতি বৃদ্ধ কাকা আসিয়া উপস্থিত হইলেন, মামারা আসিলেন, মাসী ও তাঁহার তিন ছেলেমেয়ে আসিয়া জড়ো হইলেন। ডাক্তারবাবু বলিয়াছেন, জ্বরের লক্ষণ ভাল নয়, সাবধান, বুকের ভিতরে জল ভর করিয়াছে। আমাদের বাড়ীতে রান্নাবান্না চড়ানো দায় হইল। বাবার চারিদিকে সবাই আসিয়া ঘিরিল।

আট টাকার ডাক্তার বদলাইয়া ষোল টাকা দামের ডাক্তার আনিলাম। তাঁহার ঔষধ যখন ধরিল না তখন বাবার প্রায় অচেতন অবস্থা। আমি বত্রিশ টাকার ডাক্তারকে রোজ দুইবার আনিতে লাগিলাম।

চিকিৎসা শাস্ত্রে আমার জ্ঞান নাই, রোগের নাম ও উপসর্গের

বিবরণ আমি মুখস্থ রাখিতে পারি না, কখন কি পথ্যের প্রয়োজন তাহা জানিয়া রাখিতেও আমার বিদ্যাবুদ্ধিতে কুলায় না। কেবল তাহাই নয়, রোগীর সেবা করিতেও আমি পারিয়া উঠি না। আমি দুই চারিবার ছুটাছুটি করিতে পারি, গাড়ী করিয়া ডাক্তার আনিতেও অসুবিধা ঘটে না, আড়ালে থাকিয়া নিরাময় কামনা করাও আমার পক্ষে সম্ভব, কিন্তু অসুস্থের পাশে রাত জাগিয়া বসিয়া থাকা, সেবা করা, ঔষধ ও পথ্য খাওয়ানো, ওজন করিয়া যত্ন করা—হে ঈশ্বর, আমাকে ছাড়িয়া দাও, আড়ালে গিয়া বরং হাঁফ ফেলিয়া বাঁচি!

আত্মীয় স্বজনের ভিতরে আমি নরাধম বলিয়া আখ্যাত ছিলাম, তাহারা আমাকে পঁচিশ বছরের নাবালক বলিয়া তিরস্কার করিত। আজ তাহারা আসিয়া যখন বাবার রোগশয্যাকে ঘিরিয়া বসিল, আমি যেন অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করিলাম। তাহাদের সহিত আমার সম্পর্ক কম, চিরকালই হিতার্থিগণকে এড়াইয়া আসিয়াছি, সুতরাং আজও তাহাদের সহিত মাখামাখি করিবার কারণ দেখিলাম না। অবশ্য আড়ালে আব্‌ডালে থাকিয়া আমার প্রতি তাহাদের বিরক্তি-প্রকাশ কানে যে আসিল না, তাহা নহে। আমি পিতার একমাত্র সন্তান, সেজন্য যেন একটা পারিবারিক দুঃখ আছে; আমি যে ভবিষ্যতে একটা বৃহৎ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইব, ইহাও যেন

আমার একটা ভয়ানক অপরাধ। অনেকে অনেক সময়ে আমার উদ্দেশে কটাক্ষ করিয়া মাকে বলিতেন, ভাগ্যি তোমার ভাল নয় মা, একটি তরকারী তাও নুনে পোড়া! আমাকে যত বারই তাঁহারা দেখিয়াছেন ততবারই বলিয়াছেন, বুঝলে বাবা, চরিত্রটি বজায় রেখে চ'লো। বলা বাহুল্য, তাঁহাদের উপদেশ পাইয়া সেইদিনই প্রাণ ভরিয়া চরিত্র নষ্ট করিয়া ঘরে ফিরিয়াছি। আমার জীবনে দেখিয়াছি, সংযমশিক্ষা দেওয়ার বক্তৃতা শুনিলে তখনই যেন মনের অসংযত প্রবৃত্তিগুলি কিল্ কিল্ করিয়া বাহিরে আসিতে চায়।

আমার বুকের ভিতরে কখনও জল ভর করিয়া জ্বরে অচেতন হই নাই, সুতরাং বাবার অসুখের গভীরতা প্রথমটা আমার অগোচর ছিল। কিন্তু মায়ের চক্ষু যখন জলে ভরিয়া উঠিতে লাগিল তখন তাঁহারই মুখে আসন্ন দুর্যোগের ছায়া দেখিতে পাইয়া শঙ্কিত হইয়া উঠিলাম। মায়ের মুখে চিরদিন তেজস্বিনীকে দেখিয়াছি, বাৎসল্যের মধুর সঙ্কেত লক্ষ্য করিয়াছি; কিন্তু স্বামীর মৃত্যু আশঙ্কা করিয়া এমন একটা অদ্ভুত ব্যাকুলতা লক্ষ্য করি নাই। শুনিয়াছি নিতান্ত বালিকা-বয়সে মায়ের বিবাহ হইয়াছিল। ইহাও শুনিয়াছি, প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমায় আসিয়া দাঁড়াইবার পূর্বে একজন অপর জনকে ছাড়িয়া একটি দিনও যাপন করেন নাই,—আজ মায়ের মুখের চেহারায় যেন দেখিতে

পাইলাম—সেই অচ্ছেদ্য গ্রন্থির স্নায়ুতন্ত্রে কেমন একটা বিচ্ছেদ সম্ভাবনার চিড় খাইয়াছে। ইহা কি বস্তু, তাহা আমি জানি না; ইহার কি নাম তাহাও আমার অজ্ঞাত; কিন্তু ইহার অন্তরে অন্তরে যে একটি মহৎ সংস্কৃতি ও শিক্ষা আছে, তাহাই যেন এই দুর্যোগের আচ্ছন্ন সমস্ত পরিবেশের ভিতর হইতে আমি আহরণ করিলাম।

বাবার প্রদীপটি ম্লান হইতে ম্লানতর হইয়া আসিল। আমার সকল চিন্তা স্তব্ধ হইয়া একটা দিকেই যেন ভীষণ হইয়া উঠিতে লাগিল।

এই কথাটা এতদিন কল্পনা করি নাই যে, মা-বাবার দুই-জনের একজন কখনও মরিতে পারেন; কিন্তু সেদিন সন্ধ্যায় যখন ডাক্তার আমার সহিত কথা না বলিয়া এবং ভিজিটের টাকা গ্রাহ্য না করিয়া সটান্ গিয়া মোটরে উঠিলেন ও ড্রাইভার গাড়ী চালাইয়া দিল, তখন আমি, পঁচিশ বছরের নাবালক ও নরাধম, আমার ভিতরটা যেন ধক্ করিয়া উঠিল। যে প্রাচীন বনস্পতির নিরাপদ ডালপালার ভিতরে নিশ্চিন্তে বাসা বাঁধিয়া নানা জায়গায় খাবার ছোঁ মারিয়া খাইয়া এতকাল পরমানন্দে উড়িয়া বেড়াইতাম, মনে হইল, আজ বড় একটা কঠিন সমস্যার দিকে ঠেলিয়া দিয়া সেই বনস্পতি শিকড় উপড়াইয়া হুমড়ি খাইয়া পড়িতেছে। আজ আমি চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম,

আমাদের এই বাড়ীর দেয়াল ও কড়িকাঠ, উঠান ও প্রাচীর, টেব্‌ল ও আলমারি,—সমস্তেরই চেহারা যেন এক আকস্মিক তুহিন-ঝটিকায় সম্পূর্ণ বদলাইয়া গিয়াছে। আমি এইবার বাবার কাছে গিয়া বসিলাম।

অচেতন অবস্থার ভিতরে তিনি কি যন্ত্রণা সহ্য করিলেন, মুখ বুজিয়া নীরবে কোন্ মন্ত্র জপ করিলেন, তাহা আমরা কেহই বুঝিতে পারিলাম না। মাত্র তেরোটি দিন রোগে ভুগিয়া তাঁহার অন্তিমকাল উপস্থিত হইল, তাঁহার চক্ষুর পলক আর পড়িতে চাহিল না। সকলে চেঁচাইল, কাঁদিল, গোলমাল করিল এবং নেপথ্যে মহাকাল আসিয়া তাঁহার পাওনা আদায় করিবার জন্য হাত বাড়াইলেন, ধীরে ধীরে বাবার মৃত্যু হইল।

মৃত্যু আমি এমন করিয়া দেখি নাই। চিরদিন সম্ভোগ-বাসনার দিকে মুখ ফিরাইয়া জীবন যাপন করিয়াছি, স্বভাব-চটুলতার প্রশ্রয়ের ভিতরে বড় হইয়া উঠিয়াছি, বেদনা ও দুঃখ কি বস্তু, তাহা আমার নিকট অজ্ঞাত; দুর্ভাগ্যের কারুণ্য কাহাকে বলে তাহা আমি জানি না; কিন্তু আজ শ্রাবণ মাসের বর্ষণমুখর রাত্রে যখন বাবার চিতা রচনা করিতে গিয়া ভিজা কাঠ জ্বালাইতে না পারিয়া ধোঁয়ায় চক্ষু অন্ধকার হইয়া আসিতে লাগিল, তখন আমি যেন সেই দু'একটা আগুনের শিখায় নিজের চেহারাটাই একবার দেখিতে পাইলাম। মৃন্ময়ীর মা

যেদিন মরিয়াছিলেন, সেদিনও শ্মশানে আনিয়া তাঁহাকে দাহ করিয়াছি ; কিন্তু তাহার ভিতরে ছিল আমার মনের নির্লিপ্ততা, পরোপকারের একটা চাপা গর্ব, প্রাণটা পড়িয়াছিল লোভের বস্তুর দিকে। কিন্তু আজ যেন কেমন একটা নিদ্রা ভাঙিয়া গেল, আমি সমস্ত সংসারের মূল্য নূতন করিয়া কষিতে লাগিলাম। আমার যেন দশ বছর বয়স বাড়িয়া গেল।

ইহার পরে যাহা কৃত্য, তাহা একে একে শেষ হইল। অশৌচ পার হইল, দান-সাগর শ্রাদ্ধ চুকিল, নিয়ম-ভঙ্গ হইয়া গেল। আমি মুণ্ডিত-মস্তকের উপর একটি গান্ধীটুপি বসাইয়া পথে বাহির হইলাম। শোকের তীব্রতা কমিয়া গেল। কয়েক-জন আত্মীয়স্বজনের সহিত মা বিধবার বেশে পুনরায় সংসারের রাশ ধরিলেন। বলা বাহুল্য, তিনি আমার দিকে তাঁহার মুখ ফিরাইলেন।

মাসখানেক পরে একদিন সন্ধ্যার পর বাড়ী ফিরিয়াছি, মা আমার ঘরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, এ সব কি কাণ্ড রে ?

মুখ ফিরাইয়া বলিলাম, কি বলো ত ?

তিনি বলিলেন, সরোজিনীর সেই মেয়েটা তোকে আবার খুঁজতে এসেছিল কেন ?

এসেছিল নাকি ?—বলিয়া অনেকটা ঔদাসীন্যের সহিত আমি জামাটা খুলিতে লাগিলাম।

মা বলিলেন, কি দরকারে এসেছিল ?

বলিলাম, তা ত' বলতে পারি নে। তবে বোধ হয় বাবা মারা গেছেন, তাই একটু সান্ত্বনা দিতে—

সান্ত্বনা দিতে এলো সে ? দেশে আর লোক ছিল না ? সে জানলে কেমন ক'রে ?

এই কথাটা ভাবিয়া দেখি নাই। আমি যে ইতিমধ্যে মৃন্ময়ীর নিকট অনেকবার যাতায়াত করিয়াছি, বাবার মৃত্যুর পরের দিনও তাহার নিকট একবেলা বসিয়া আলাপ-আলোচনা করিয়াছি, তাহাদের টাকা পয়সা দিয়াছি, বাবার আরও পুরাতন পত্র তাহার নিকট পাইয়া পড়িয়াছি, ইহা আমি চাপিয়াই ছিলাম। এ সম্বন্ধে আমার মনোবিকলন কাহারও নিকট প্রকাশ পাইতে দিই নাই। মায়ের প্রশ্নের উত্তরে কেবল বলিলাম, তা'ত বলতে পারি নে।

মা বলিলেন, আমি তাকে আগে চিনতে পারিনি। পরিচয় নিলুম, সে সব বললে। তোমাকে খুঁজতে এলো কেন, তাই জানতে চাইলুম, বললে, এমনি। বলি, তোর ব্যাপার কি রে, রাজেন ?

হাসিয়া বলিলাম, কেন বলো ত ?

মায়ের মুখ গম্ভীর, কঠিন। বলিলেন, তুই কি তার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিস ?

বলিলাম, পাগল নাকি।

তুমি জান রাজেন, এসব আমি ভালবাসিনে !

আমি ধীরে ধীরে বলিলাম, তুমি অকারণে বড় বেশী কঠিন হ'চ্ছ, মা। সে কি তোমাদের কোনো ক্ষতি করেছে।

মা বলিলেন, এ বাড়ীতে তার পা দেওয়াই ক্ষতিকর। তুমি যদি তার সঙ্গে ভাব আলাপ করো, সেই ক্ষতি আমার আরও বেশী।

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। জবাব দিতে পারিতাম, কিন্তু তাহা অত্যন্ত রূঢ় হইত। মা জানেন না যে, আমি একটা বারুদের স্তূপ হইয়া আছি। মা ইহাও হয়ত জানেন না যে, যাহারা দুর্বল, আমি তাহাদের হইয়া লড়াই করিবার একটা শক্তি সঞ্চয় করিয়াছি। আগে হইলে হয়ত মায়ের কথায় সতর্ক হইতে পারিতাম ; কিন্তু পিতার চিতাগ্নির আভায় আমি যে নূতন করিয়া সমস্ত সংসারটার ভালমন্দ পরীক্ষা করিয়া লইয়াছি, তাহাতে আর আমার কাহাকেও ভয় করিবার কারণ নাই।

মুখে বলিলাম, আচ্ছা, ব্যস্ত হয়ো না, তুমি তোমার কাজে যাও।

মা যাইলেন না। পুনরায় বলিলেন, তুই যার ছেলে তারই আদেশ যে, ওদের ছায়া কেউ কোনদিন মাড়াতে পাবে না।

বলিলাম, বাবা এ আদেশ কবে দিয়েছেন, মা ?

এ আদেশ তাঁর চিরকালের।

যদি সত্যি না হয় ?

মা বলিলেন, যদি না জেনে থাক, তবে জেনে রেখো ওদের মতন অধার্মিক মানুষ ভূভারতে নেই।

মুখে যাহা আসিয়াছিল তাহা বলিয়া ফেলিতে পারিতাম কিন্তু মায়ের দিকে পিছন ফিরিয়া একখানা চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িলাম। স্ত্রীলোক সম্বন্ধে আমার কিছু কিছু দুর্বলতার কথা মা যে একেবারেই জানিতেন না, তাহা নহে। ইহার প্রতিকার করিবার চেষ্টা তিনি করেন নাই, কারণ তিনি মনে করিতেন আমার এ দুর্বলতা সাময়িক, যথাসময়ে এ নেশা কাটিয়া যাইবে। ইহা লইয়া তিনি এক আধবার সজাগ ও সতর্ক করিতেন, কিন্তু এমন করিয়া শাসন করেন নাই। সরোজিনীর সম্বন্ধে মায়ের মনে যে গভীর ক্ষত আছে, আজ মৃন্ময়ীর আনাগোনায় সেই ক্ষত হইতেই রক্তক্ষরণ হইতেছে।

মা বলিলেন, চুপ ক'রে রইলি যে ?

বলিলাম, কি বলবো বলো ?

ওকে একখানা পোস্টকার্ড লিখে বারণ ক'রে দে, এ বাড়ীতে যেন না আসে।

আচ্ছা দেবো।—বলিয়া আমি এক মুহূর্ত নীরব থাকিয়া পুনরায় বলিলাম, তাদের ওপর তোমার রাগের কারণটা জানিনে অথচ অধার্মিক ব'লে আমি তাদের অপমান ক'রে তাড়াবো, এই কথাটাই ত' আমি বুঝিনে।

মা উষ্ণকণ্ঠে বলিলেন, ওরা একদিন আমাদের সর্বনাশ করবার চেষ্টায় ছিল।

বিস্মিত হইয়া বলিলাম, ওই মা আর মেয়ে?

হ্যাঁ।

ওদের চালচুলো নেই, শক্তিসামর্থ্য নেই, মাথার ওপর কোনো সহায় নেই, ওরা করবে আমাদের সর্বনাশ?—এই বলিয়া হাসিলাম। পুনরায় বলিলাম, এ যেন অনেকটা ভূতের ভয়, মা।

মা কাছে আসিলেন। কিন্তু উপলব্ধি করিলাম, আমার মাথায় হাত রাখিয়াই তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, ওরা সব পারে। ওই মেয়েকে কখনও বিশ্বাস করিস্‌নে, ওর রক্তের মধ্যে আছে শয়তানী বুদ্ধি।

বলিলাম, কিন্তু তোমার মতন মনোভাব হয়ত বাবার ছিল না। যাক্‌গে ওদের আলোচনা। আচ্ছা, আমি ব'লে রাখলুম আর কোনদিন সে এ বাড়ীতে পা দেবে না।

তুইও যাবিনি বল ?

আচ্ছা।

মা চোখ মুছিয়া চলিয়া যাইবার সময়ে বলিয়া গেলেন, যদি মায়ের মান বজায় রাখতে চাস, তবে আর কোনদিন ওদের ছায়া মাড়াবিনে।

এমন একটা বেকার-বিকৃত জীবনকে লইয়া আমি কি করিব তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। আমি যে কাজের মানুষ নহি ইহা আমি যেমন বুঝিয়াছি, অপরেও তেমনি বুঝিতে পারিয়াছে। কিন্তু তবু জীবনটাকে লইয়া আপাতত কি করা যাইতে পারে, তাহাই চিন্তা করিতে করিতে একদিন পথে বাহির হইয়া পড়িলাম।

বাবার উইলের প্রবেট্ পাইতে আমার বিলম্ব হইবে না। কলিকাতায় যে পাঁচখানা বাড়ী আছে, তাহার চারখানা আমার, একখানা মায়ের নামে। কোম্পানীর কিছু কাগজ মায়ের, বাদ-বাকী সমস্তই আমার। চটকল ও সিমেণ্ট কোম্পানীর সমস্ত শেয়ারগুলিই আমার। ব্যাঙ্কের টাকা হইতে মা মাত্র দশ হাজার পাইবেন, বাকী সবই আমার। খুচরা পাঁচ দশ হাজারের কথা আমি চিন্তা করি না ; কারণ তাহা জঞ্জালের ন্যায় আমার পায়ের কাছে আসিয়া পৌঁছিবে জানি।

মনে করিলাম, কিছুকাল জুয়া খেলিয়া আনন্দ লাভ করিব। কিন্তু ভাগ্য অপেক্ষা কৌশলের প্রশ্ন যে খেলায় বড় বলিয়া

আমি সন্দেহ করি, সেখানে আমি পারিয়া উঠিব না। আমি দুষ্ট ও দুরন্ত, কিন্তু তাহা চাতুরী অপেক্ষা নির্বুদ্ধিতার পথ ধরিয়া চলে,—সুতরাং জুয়াখেলায় হারিতেই হইবে, জিতিতে পারিব না। আমার অভিন্নহৃদয় দুই চারি জন বন্ধু পরামর্শ দিলেন, একটা সিনেমা কোম্পানী খুলিয়া ছবি তুলিলে সব দিকেই লাভবান হইব। সুন্দরী অভিনেত্রী সংগ্রহ করা কষ্টকর হইবে না এবং তাহাদের অনেক সময়ে ভদ্র ও সম্ভ্রান্ত পরিবার হইতে সংগ্রহ করা যাইতে পারে। প্রাণের ভিতরটা পুনরায় খুশি হইয়া উঠিল। এই দিক্‌টার সহিত আগে হইতেই আমার কিছু কিছু পরিচয় আছে ; আর কিছু নাই হোক, অভিনেত্রী সংগ্রহ করিয়া বেড়াইতে পারিলে আমার ইহকাল ও পরকাল দুই রক্ষা হইবে। বন্ধুরা সতর্ক করিয়া দিলেন, খবরদার, বিবাহ করিতে পারিবে না কিন্তু, করিলে সব মাটি হইবে।

বলিলাম, তথাস্তু।

ঝুপ করিয়া একদিন কাজে নামিয়া পড়িলাম। কিন্তু কাজে নামিবার সঙ্গে সঙ্গে একদল ভদ্রলোক একদিন দেখা করিতে আসিয়া বলিলেন, তাঁহারা আমার সাহায্যে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিতে চান।

পুলকিত হইয়া বলিলাম, খুব ভাল কথা, এ ত' দেশের কাজ। ইস্কুলটা কেমন হবে ?

তাঁহারা বলিলেন, ছেলেমেয়েরা একসঙ্গেই পড়াশুনা করবে। সহশিক্ষার প্রসার।

বলিলাম, খুবই উপকার হবে, কারণ এতে বিবাহের যৌতুক প্রথাটা উঠে যাবে। স্বাধীন প্রণয়টা চালু হয়ে গেলে ছেলের বাপরা আর টাকা চাইতে ভরসা করবে না। সহশিক্ষার পরিণত ফল পণ-প্রথা-নিবারণ!

তাঁহারা লজ্জিত হইয়া বলিলেন, আজ্ঞে, এদিক্ থেকে কথাটা আমরা ভেবে দেখিনি, আমরা শিক্ষাপ্রসারের দিক্ থেকেই ভাবছিলুম।

বলিলাম, এটা হ'লে ওটা হবে। ধরুন, ঘটকালির টাকা লাগবে না, অলঙ্কারপত্র ইচ্ছামত, বিবাহের সামাজিক খরচ ক'মে গেল, ছেলেমেয়ের পছন্দ হবে নির্বিঘ্ন,—প্রণয়ের ব্যাপারে মেয়ের বাপ হবে লাভবান্। বেশ, আপনারা তাই করুন, আমি রাজি।

কিন্তু শিক্ষার দিক্ থেকে—তাঁহারা বলিলেন।

হবে বৈকি, ওটাও হবে। ধরুন, একটা উৎকৃষ্ট প্রজাপতি-সমিতি গ'ড়ে তোলাও ত' দেশের একটা মস্ত বড় কাজ।

তাঁহারা কি যেন সন্দেহ করিয়া 'আবার একদিন আসবো' বলিয়া সেদিনকার মতো বিদায় লইলেন। কিছুদূর গিয়া সহসা একজন পিছন ফিরিয়া লক্ষ্য করিলেন, আমি তখনও

তাঁহাদের দিকে চাহিয়া হাসিতেছি। বলা বাহুল্য, আর তাঁহারা আসেন নাই।

যে পরিমাণ টাকা আমার আছে, তাহাতে আমাদের জীবন নিশ্চিন্তে চলিয়া যাইবে। সেই টাকাকে ব্যবসায়ে খাটাইয়া বাড়াইবার প্রয়োজন আমার নাই; বরং তাহা হইতে যদি বা কিছু নষ্ট নয়, তাহাও স্বীকার করিয়া লইতে পারিব। আর নষ্টই বা বলিব কাহাকে? মৃন্ময়ীকে যেটুকু সাহায্য করিতে পারিয়াছি তাহা মায়ের বিচারে নষ্ট, কিন্তু আমার বিচারে হয়ত সার্থক। সুতরাং এই কথাটাই সর্বাগ্রে জানাইল, নষ্ট হওয়া বলিয়া কোন পদার্থ জগতে নাই, কিছুই নষ্ট হয় না, সমস্ত বস্তুরই একটা চরম লক্ষ্য আছে।

এই যে আমি সেদিন একটি পাঠাগার-প্রতিষ্ঠার জন্য কিছু টাকা ও বই খয়রাৎ করিলাম, এই যে সিনেমা কোম্পানী খুলিবার জন্য এই প্রতিযোগিতার বাজারে দুঃসাহসিকের ন্যায় অবতীর্ণ হইতেছি, ইহার উদ্দেশ্য কি কেবল লাভবান্ হওয়া?

কিন্তু আমার ভাগ্যবিধাতা যে আমার পাশে থাকিয়াই নিরন্তর হাসিতেছিলেন, আমার সেদিকে লক্ষ্য ছিল না।

সিনেমা কোম্পানীর অফিস খুলিবার জন্য কলিকাতার হৃৎপিণ্ডে একটি বাড়ী ভাড়া করিলাম। বালিগঞ্জে অন্যের একটি ষ্টুডিও প্রয়োজন মত ভাড়া লইব, এবং এই বাড়ীটা হইবে

আমাদের স্থানীয় কর্মকেন্দ্র। অতএব অভিনেতা ও অভিনেত্রী চাহিয়া আমি নিজের নামে দৈনিক সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিলাম। বলা বাহুল্য, যে সকল গুণপণা দাবী করিয়া বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিলাম, তাহাতে পতিতাগণের পক্ষে আবেদন করা সম্ভব নয়। আমার উদ্দেশ্য ছিল রহস্যময়।

এমন একটা প্রতিষ্ঠানের আমিই চালক হইব, ভাবিতেই আমার রোমাঞ্চ পুলক লাগিতেছিল। সন্ধ্যার সময়টাই প্রশস্ত, দেখা-সাক্ষাৎ করিবার জন্য এই সময়টাই দিয়াছিলাম। দুই তিন দিন কেহ আসিল না, চার দিনের দিন খবর পাইলাম, একজন মহিলা আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। তাঁহাকে বাহিরে বসানো হইয়াছে।

অভিনয়-জগতের মেয়েদের পক্ষে সর্বপ্রধান প্রশ্ন—রূপ। রূপশ্রী, স্বাস্থ্য, শরীরের ছন্দময় গঠন, কণ্ঠস্বর—এগুলি হইতে শিক্ষা ও কৃতিত্বের অভাব পূর্ণ করিয়া লওয়া যায়। রূপহীনা মেয়ে আমি আমার কোম্পানীতে নিয়োগ করিতে পারিব না, এই আমার সঙ্কল্প ছিল। সেইজন্য আমি আমার নবনিযুক্ত কেরাণীকে ডাকিয়া বলিলাম, আগে তুমি বাইরে গিয়ে দেখে এসো ত' মেয়েটি দেখতে কেমন? সেই বুঝে তাহার সঙ্গে আলাপ করবো।

কেরাণী ছোকরা বাহির হইয়া গেল এবং মিনিট দুই পরে

আসিয়া আমার সম্মুখে ঢোঁক গিলিয়া দাঁড়াইল। বলিলাম, কেমন দেখলে?

সে কহিল, এমন কখনও দেখিনি।

এতই কুৎসিত!—

আপনিও এমন কখনও দেখেননি আমি বাজী রেখে বলতে পারি।

দেখতে সুন্দর কি না, তাই আগে বলো।

সে কহিল, অতি আশ্চর্য রূপ, একেবারে দেবীস্বরূপ। আপনার প্রত্যেক বইয়ের প্রধান নায়িকা হবার যোগ্য।

আচ্ছা, ডেকে আন।

কেরাণীটি বাহির হইয়া যাইতেই আমি আমার মাথার চুলটা ঠিক করিয়া লইলাম; ভব্য হইয়া বসিয়া মুখের উপর একটি মিষ্টহাসি টানিয়া আনিলাম এবং এমন করিয়াই দরকারী কাগজ-পত্রের মধ্যে নিজেকে ডুবাইয়া দিলাম যে, বেশীক্ষণ কথাবার্তা বলিয়া কিছুতেই সময় নষ্ট করিতে পারিব না!

বাহিরে হিল্‌-তোলা জুতার শব্দ পাইলাম, আনন্দে শরীর রোমাঞ্চ হইয়া উঠিল। কিন্তু পর মুহূর্তেই পর্দা তুলিয়া যাহাকে প্রবেশ করিতে দেখিলাম, তাহার পর আমার মুখে কথা সরিল না।

মৃন্ময়ী নিজেই একখানা চেয়ার টানিয়া বসিল, এবং আমার কেরাণীকে কহিল, আপনি দয়া ক'রে এবার বাইরে যান।

ছোকরা আমাদের দুইজনের মুখের দিকে চাহিয়া সহসা মুখ ফিরাইয়া বাহির হইয়া গেল।

মৃন্ময়ী হাসিমুখে বলিল, কত মাইনে বলুন ?

আমিও এবার হাসিলাম, বলিলাম, যোগ্যতা বিচার ক'রে তবে ত মাইনে।

ওঃ, আমি খুব ভাল অভিনয় করতে পারি, তা' বুঝি জানেন না ?

বলিলাম, জানি, দেখতেই ত' পাচ্ছি। সাজসজ্জার এত ঘটা, রুজ-পাউডারের এত চাকচিক্য,—আমার ওই কেরাণীটির একেবারে মাথা ঘুরে গেছে।

মৃন্ময়ী বলিল, কি করব বলুন, এ না হ'লে ত' আপনার এখানে চাকরী হবে না।

বলিলাম, মৃন্ময়ী, তুমি নাচতে গাইতে জান ?

খুব জানি।

কত মাইনে চাও ?

সে হাসিয়া কহিল, আপনার মতন স্বত্বাধিকারীর কাছে বিনা মাইনেয় চাকরী করব।

আমি হাসিয়া ফেলিলাম, তোমার উদ্দেশ্য দেখছি অতি মহৎ। শিল্পকলা-প্রসারের জন্য স্বার্থত্যাগ।

সে এইবার গলা নামাইয়া বলিল, মায়ের ওপর রাগ ক'রে এসব কি কাণ্ড করছেন বলুত ত ?

কেন, এ ব্যবসা কি মন্দ ?

আপনি কিচ্ছু জানেন না এই ব্যবসার। মাঝখান থেকে কতকগুলো নোংরা ঘাঁটাঘাঁটি করবেন, আমি বুঝতে পাচ্ছি। এ কাজ আপনাকে ত্যাগ করতে হবে।

সভয়ে বলিলাম, কি বলছ মৃন্ময়ী, কতদূর আমি এগিয়েছি জান ?

জানি। দু'চারজন লোককে কাজে নিযুক্ত করেছেন, যন্ত্রপাতির দরদস্তুর করছেন, বাড়ীটা ভাড়া নিয়েছেন আর ফাঁদ পেতে আছেন ভদ্রঘরের ছেলে-মেয়েদের অসৎপথে নিয়ে যাবার জন্য।—এই বলিয়া মৃন্ময়ী ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকাইতে লাগিল।

বলিলাম, তুমি জান যে, ইতিমধ্যে এর জন্যে আমি অনেক টাকা খরচ করেছি ?

কত টাকা ?

প্রায় দেড় হাজার।

আমি দিয়ে দেবো, এ কাজ আপনি বন্ধ করুন।

তুমি দেবে ? বলিয়া হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলাম।

হ্যাঁ, আমি দেবো, এই বলিয়া সে তাহার হাতের ভ্যানিটি ব্যাগটি আমার টেব্‌লের উপর ছুঁড়িয়া দিল।

অবাক্ হইয়া বলিলাম, কি আছে এর মধ্যে ?

সে বলিল, যা আছে আপনি রেখে দিন্, আমার চালচুলো নেই, আমি ও সব রাখবো কোথায় ?

তাহার ব্যাগ খুলিয়া আমি হতবুদ্ধি হইয়া গেলাম। বলিলাম, এ কি, এত টাকা তুমি পেলে কোথায় ?

সে কহিল, দেশবাসীর টাকা।

মানে ?

মানে, আমার ভাইরা ছিনিয়ে এনেছে ব্যাঙ্ক থেকে।

কি ভাবে ?

এমন কিছু নয়, প্রাণভয় দেখিয়ে।

ভয়ে সর্বশরীরে কাঁটা দিল। ঢোঁক গিলিয়া শুষ্ককণ্ঠে বলিলাম, এ টাকা আমি রাখবো দ্বীপান্তরে যাবার জন্যে ?

মৃন্ময়ী বলিল, না। আপনি কেবল এই নোংরা কাজ ত্যাগ করুন, নৈলে আমিই আপনাকে দ্বীপান্তরে পাঠাবো।

বলিলাম, তুমি আমার চিঠি পেয়েছিলে ? তোমাকে জানিয়েছিলুম আর কোনদিন আমাদের দেখা হবে না।

হাসিমুখে মৃন্ময়ী বলিল, চিঠিতে মায়ের প্রতি অভিমান ফুটেছিল, আর যা অস্পষ্টভাবে ছিল সেটা আপনার ছেলে-মানুষী।

তার মানে ?

মৃন্ময়ী নতমস্তকে বলিল, সে সব অতি বাজে কথা।

ঠিক মনে নেই, কি বল ত।

সে আবার হাসিল। বলিল, উচ্ছ্বাস আর স্তাবকতা।

মিছে কথা। আন সে চিঠি।

সে কহিল, মিছে কথা হলেই খুশি হবো। সে চিঠি আমি আগুনে পুড়িয়ে ফেলেছি। নিন, উঠুন, আর দেরী করবেন না, অনেক কাজ।

বলিলাম, আমি উঠবো কোথায়, এখানে আমার অনেক কাজ বাকী।

মৃন্ময়ী বলিল, আমি রাগলে কিন্তু আপনার রক্ষে নেই। এখানকার সব কাজ আপনাকে বন্ধ করতে হবে। যার যা পাওনা আছে, চুকিয়ে দিন,—আমার সময় বড় কম!—এই বলিয়া সে পাশের ঘরে উঠিয়া গেল এবং এক মিনিটের মধ্যেই আমার কেরাণীকে ডাকিয়া আনিল।

বলিলাম, বিনয়, আমি একটু কাজে যাচ্ছি। মেয়েরা যদি আর কেউ আসে কাল আসতে ব'লে দিও।

মৃন্ময়ী বলিল, বিনয়বাবু, ওঁর কোন কথার ঠিক নেই, আমি যা বলছি তাই শুনুন। সিনেমা কোম্পানী উনি করবেন না, যদি কেউ আসে ফিরিয়ে দেবেন—

বাধা দিয়া বলিলাম, আরে, কি বলছ তুমি?

মৃন্ময়ী আমার কথা শুনিল না। বলিতে লাগিল,

আপনাদেরও কাল থেকে আসবার দরকার নেই। তিন মাসের মাইনে প্রত্যেকে আপনারা পাবেন। কাল সকালে ওঁর বাড়ীতে গিয়ে সেই টাকা আনবেন।

বিনয় ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল। পরে বলিল, তবে কি কিছুই হবে না?

না।

আমি আবার বাধা দিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু মৃন্ময়ী বলিল, বুঝলেন বিনয়বাবু, মার ওপর রাগ ক'রে উনি টাকা নষ্ট করতে বেরিয়েছেন, কিন্তু নষ্ট করব বললেই বা করতে দেওয়া হবে কেন? আচ্ছা, এবার আপনি যান্। কাল এসে টেব্‌ল চেয়ার আলমারি আর আসবাবপত্রগুলি ফেরৎ দিয়ে আসবেন।

বিনয় মাথা হেঁট করিয়া চলিয়া গেল।

বলিলাম, করলে কি, মৃন্ময়ী?

মৃন্ময়ী বলিল, অসৎ পথ থেকে আপনাকে সরিয়ে আনা হ'ল।

রাগ করিয়া বলিলাম, ডাকাতি ক'রে টাকা ছিনিয়ে আনা আর ধর্মের ষাঁড়গুলোকে বসিয়ে খাওয়ানো বুঝি সৎপথ?

হাসিয়া সস্নেহে মৃন্ময়ী বলিল, খুব বক্তৃতা হয়েছে, এখন চলুন।

কোথা যাবে?

চলুন বেড়িয়ে আসা যাক্ একটু।

তুমি এই সাজসজ্জা ক'রে যাবে আমার সঙ্গে, লোকে বলবে কি ?

সে আমি বুঝবো, আসুন।

মৃন্ময়ীর উপর রাগ করিলাম কিন্তু তাহার আদেশ অমান্য করিতে পারিলাম না। রেশমী শাড়ীখানা এমন অপরূপ কৌশলে সে তাহার দেহলতায় আঁটাআঁটি করিয়া জড়াইয়াছে, চুলের ঝুরি নামাইয়া সুন্দর মুখখানিতে এমন করিয়া প্রসাধন আঁকিয়াছে, এমন করিয়াই তাহার রাজহংসীর চলন ঢলঢল করিতেছে যে, তাহার অবাধ্য হইবার সাধ্য আমার রহিল না। পিতার মৃত্যুর পর এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, মেয়েদের সহিত মিশিব কিন্তু দেহাসক্তির উত্তেজনা তাহাদের নিকট আর প্রকাশ করিব না। ভাবিলাম মৃন্ময়ীর এই আদেশ কেন মানিয়া লইতেছি ? এখনও আমি তাহার প্রেমে ডুবি নাই, এখনও আমি তাহাকে নষ্ট করি নাই যাহার জন্য চক্ষুলজ্জা মানিব, এখনও তাহাকে তাহার এই টাকাকড়ি কাড়িয়া লইয়া বিদায় করিয়া দিতে পারি, কিন্তু নিজের মনের চেহারা আমি অনুভব করিতে পারিলাম। আমি একজন ঔপন্যাসিক হইলে এখানে রস ফলাইয়া সত্য ও সততাকে চাপা দিতে পারিতাম, কবি হইলে রং বুলাইয়া এখানকার ইতর আত্মপ্রতারণাকে ঢাকিতে

পারিতাম কিন্তু তাহা হইবার নয়। মুখে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, সাধুতার ছদ্মবেশ চড়াইয়াছি কিন্তু মনে মনে প্রাণের তটে ভাঙন লাগিয়া আছে। আমার রক্তগত যৌন-শৈথিল্য ইতিমধ্যে ধীরে ধীরে বন্যজন্তুর ন্যায় ভিতরে ভিতরে মৃন্ময়ীকে লেহন করিতেছে, এই সত্য চাপিব কাহার ভয়ে? হয়ত মৃন্ময়ীও আমার এই সাংস্কারিক প্রকৃতির সন্ধান ক্রমশ পাইয়াছে, সেইজন্য আমাকে বাগ মানাইতে হইলেই সে একটা অদ্ভুত বিলাসিনী রমণীর বেশ ধরিয়া আসিত। সে যেন বারে বারে এই কথাটাই প্রকাশ করিয়াছে, আমি যদি আমার স্বভাবে দৈবভাব আনিতে চাই তবে তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই আনিতে হইবে, আর যদি বীভৎস প্রবৃত্তির তাড়নায় অতল তলে তলাইতে চাই তবে তাহারই হাত ধরিয়া নামিয়া যাইতে পারিব, কিছু অসুবিধা হইবে না।

স্ত্রীলোকের পরিপুষ্ট দেহ পাইলেই আমি খুশি থাকিতাম, তাহাদের মনের দিকে চাহিবার ইচ্ছা ও অবসর আমার হয় নাই, ও-বস্তু তাহাদের মধ্যে আছে এই সংবাদ শুনিলেই আমি হাসিয়া ফেলিতাম। উহারা জীবন্ত মাংস-পিণ্ডের ন্যায় চলিয়া ফিরিয়া বেড়ায়, ঈশ্বরের অসীম অনুগ্রহে পৃথিবীর জল-বাতাসে উহারা সুপুষ্ট হয় এবং আমাদের ক্ষুধা পাইলেই উহাদের ধরিয়া কচি ও নধর মাংসের আস্বাদ করি—ইহাই বিশ্বের নারীজাতির আবহমান কালের ইতিহাস। সৃষ্টির বিবর্তনে মানুষের ঐতিহ্য-

কাহিনী, পুরুষের বর্বরতা ও সাধুতা, পুরুষের ভোগ ও ত্যাগ, পুরুষের সৃষ্টি ও ধ্বংস—ইহাদেরই কেন্দ্র করিয়া রচিত হইয়াছে, সেখানে নারীর স্বাতন্ত্র্যের কোথায় প্রমাণ পাইলাম? শক্তির আধার বলিয়া নারীকে যাহারা হ্লাদিনীর উৎস বলিয়া স্তুতিবাদ করে তাহারা কি জানে না যে, পদ্মের ভিতরে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা সূর্যদেবতারই অনুগ্রহে? জানে না কি পুরুষের পঞ্জরাস্থি হইতেই তাহাদের শক্তির উদ্ভব? কবি বলো, দার্শনিক বলো, যোগী বলো,—নারীর স্তুতিবাদের মূলে তাহাদের সেই একই সৃজন-কামনা, একই যৌন-শৈথিল্যের লক্ষণ,—অন্তত ইহাই আমি বিশ্বাস করিতাম।

কিন্তু আমার জীবনে যে-পথবাসিনীকে পথের উপর হইতেই কুড়াইয়া পাইলাম, আজ এই সন্ধ্যায় তাহাকে সহসা অপরূপ বলিয়া মনে হইল। উঁচু আসনে তাহাকে বসাইয়া নারী-লোলুপ বাক্যবাগীশের ন্যায় পূজা দিবার দুষ্প্রবৃত্তি আমার নাই, তাহাকে লইয়া প্রাণের মধ্যে গীতিকাব্য রচনা করিবার অবসরও আমি খুঁজিয়া পাইলাম না, কিন্তু অন্ধকার পথে নামিয়া মৃন্ময়ীর হাতখানা ধরিতে গিয়া সহসা নিজেকে সম্বরণ করিলাম। আমার দুরন্ত রথচক্রের গতির পথে যে-মেয়ে অলজ্ঘ্য বাধা বিস্তার করিল, আজ তাহার মুখখানি আর একবার ভালো করিয়া দেখিলাম। বিলাসিনীর লোভনীয় সাজসজ্জায় ইহা রমণীয় মুখ

সন্দেহ নাই, আমার নারকীয় কামনার সহচারিণী হইবার আপত্তিও সে-মুখে দেখিলাম না, আমার সহিত পাতালপথে যাইতেও সে প্রস্তুত, কিন্তু তবু যেন আমার কেমন সন্দেহ হইল। সেদিন রাত্রে এই রমণীই কল্যাণী প্রতিমার মূর্তিতে আমার সম্মুখে বসিয়া আমারই জন্য কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল, আমার ভিতর হইতে দেবত্বকে উদ্ধার করিয়া আমার জীবনকে উর্ধ্বায়িত করিয়া তুলিবার একটি পরম ব্যাকুলতা এই মুখের উপরেই অঙ্কিত দেখিয়াছিলাম। ভালোবাসা পাইতে চাহে না, আমাকে ভালোবাসিয়া আমার জীবনকে অসুবিধার মধ্যে লইতেও তাহার অভিরুচি নাই, তাহার জীবনের কোন স্বার্থকে আমার সহিত জুড়িয়া দিয়া কাজ হাসিল করিবার ফন্দীও তাহার দেখিলাম না,—সেই রাত্রে আমার ভয় হইয়াছিল পাছে ইহার প্রভাবে পড়িয়া আমি রাতারাতি সচ্চরিত্র হইয়া উঠি। সেদিন আমি পলাইয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলাম। আজ আবার ইহার সাজসজ্জার নূতন খেলা দেখিয়া আমি ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া উঠিলাম।

আমার হাতে তাহার টাকার ব্যাগটা ছিল, পথে নামিয়া বলিলাম, এইভাবে তোমরা টাকা আনো, বিপদের ভয় করো না ?

মৃন্ময়ী বলিল, বিপদ ত' মানুষের পদে পদে, তাই ব'লে কি

ব'সে থাকবো ? আপনিও ত' একটা মূর্তিমান বিপদ। এই বলিয়া সে হাসিল।

ইহার অকপট সাহস দেখিয়া অনেকদিনই আমি শিহরিয়া উঠিয়াছি, মনে মনে ইহার নিকট নিজেকে ভীরু বলিয়া অনুভব করিয়াছি, কিন্তু তাহার শেষ কথাটায় আমিও হাসিয়া ফেলিলাম। বলিলাম, তবে এমন বিপদ মাথায় নিয়ে রাস্তাঘাটে চলাফেরা কেন ?

সে বলিল, বিপদকে নিয়ে খেলা করায় কম আনন্দ ?

বটে, আমি তোমার খেলার সামগ্রী ?

আপনাকে নিয়ে খেলা করব কেন, করি নিজেরই প্রাণ নিয়ে।

প্রাণের মায়া নেই তোমার ?

খুব আছে।—মৃন্ময়ী বলিল, আমার কেউ নেই ব'লেই আমি নির্ভয়। কেউ থাকলে তারই কাছে আশ্রয় নিতুম, রাজেনবাবু।

তাহার কথায় কারুণ্য ফুটিল। বলিলাম, স্বাধীন মেয়ে আমিও পছন্দ করি, কিন্তু তার জীবনের ভিত্তিটা খুব শক্ত হওয়া দরকার। নইলে স্রোতের আগাছা হওয়ার নাম স্বাধীনতা নয়।

মৃন্ময়ী মুখ তুলিয়া স্বচ্ছকণ্ঠে কহিল, আগাছা কেন হবো ? মা মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গেই ত' আমি আপনার দেখা পেলুম।

মানে ?

চলিতে চলিতে হাসিমুখে সে কহিল, ভয় নেই, বিপদ আমিই মাথা পেতে নেবো, আপনাকে বিপদে ফেলবো না। লোকের কাছে কি আর বলবো আপনি আমার আশ্রয়দাতা?

বলিলাম, মনে মনেই বা কেন বলবে? আমি ত তোমাকে আশ্রয় দিইনি?

সে পুনরায় মুখ তুলিয়া বলিল, মেয়েমানুষ কি ভাবে আশ্রয় পায় একি আপনি জানেন?

বলিলাম, আমার দুর্বলতা কোথায় তা' তোমাকে জানিয়েছি। আমাকে এতটা বিশ্বাস ক'রো না মৃন্ময়ী।

এ ত' বিশ্বাসের কথা নয়, নির্ভরের কথা।

আমার বুকের ভিতরটা কেমন যেন কাঁপিয়া উঠিল। পথ চলিতে বলিতে বলিলাম, আমার ওপর কোনো মেয়ে নির্ভর করেছে, একথা শুনলে আমি শ্রদ্ধা কখনো করিনি, তাদের কল্যাণ-চিন্তা মনে কোনোদিন আনিনি।—একি, কোথায় চলেছি বলো ত?

দু'জনেরই যেন চমক ভাঙিল। চলিতে চলিতে অনেক দূর আসিয়াছি, রাত্রিও হইয়াছে, আকাশে একবার শরৎকালের মেঘ ডাকিয়া উঠিল,—চাহিয়া দেখিলাম, গড়ের মাঠের একপ্রান্তে আসিয়া পড়িয়াছি। মৃন্ময়ী বলিল, কথায় কথায় পথ ভুলে এসেছি। এবার ফির্‌বেন?

আর একটু চলো।

আবার অগ্রসর হইলাম। কিছুদূর যাইতেই একটা ঝাপটা দিয়া বৃষ্টি আসিল, আমরা একটা প্রাচীন বটগাছের তলায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। নিকটে দূরে মানুষ কোথাও নাই। দূরের পথের আলোগুলি এখান হইতে ঝাপসা দেখাইতেছিল। সেই নির্জন বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া তাহার দিকে চাহিয়া বলিলাম, এত নির্ভর করেছ তুমি আমার ওপর, কিন্তু ধরো, আমি যদি তোমার সম্ভ্রম রাখতে না পারি, মৃন্ময়ী ?

মৃন্ময়ী বলিল, মানে ?

এই ধরো, আমার প্রভাবে তুমি যদি নষ্টই হয়ে যাও ?

আবার আপনার সেই পুরনো কথা! আমি ত' বলেইছি নষ্ট হ'লে ক্ষতি আমার নয়, আপনার।

আমার ক্ষতি ? কেন ?

নষ্ট হ'লে জানবো এ আমার বিধিলিপি, কিন্তু নষ্ট যে করে শাস্তিটা ত' তারই পাওনা ?

হাসিয়া বলিলাম, তুমি এখনো ছেলেমানুষ, এখনো কৌমার্য তোমার পরিচ্ছন্ন, তাই বুঝতে পারলে না। যদি তোমাকে আবার পথের ধারে ফেলে দিয়ে মুখ মুছে চ'লে যাই তবে কোন্ শক্তি আমার সেই নিষ্ঠুরতাকে বাধা দিতে পারে? কে আমাকে দেবে শাস্তি ?

মৃন্ময়ী হাসিয়া আমার হাত ধরিল। বলিল, আপনি বড়-লোক, আর বড়লোকরাই অন্যায়কে অন্যায় বলে না। তবু শাস্তি আপনি পাবেন, আমি জানি।

কে দেবে সেই শাস্তি? হাইকোর্ট, না ভগবান?

না, আপনি নিজে।

বলিলাম, আমি নিজে? তুমি কি মনে করো তখন আমি অনুতাপ করবো? আমাকে তুমি এখনো চেননা মৃন্ময়ী, নিজের কৃত অপরাধ আমার নিজেরই বেশী দিন মনে থাকে না। আর শাস্তি দেব নিজেকে? পাপকে পাপ ব'লেই আমি মনে করিনে। যে কোন অন্যায়কে একটা আকস্মিক দুর্ঘটনা ব'লে মনে করি, আর সেই য়্যাক্সিডেণ্ট্ ভুলতেও আমার দেরি হয় না।

মৃন্ময়ী হাসিয়া বলিল, নিজের বাইরের দিকটাই আপনি চেনেন, ভেতরের দিকটা নয়। আপনার দিকে যখন চোখ তুলে চেয়েছিলুম তখন আপনার বয়স তেরো আর আমার প্রায় দশ। বেশ মনে পড়ে শিবের গাজন গাইতুম দু'জনে গলা ধরাধরি ক'রে, কিন্তু মেয়েমানুষের প্রাণ প'ড়ে থাকতো পুরুষের প্রাণের দিকে। মোটাসোটা মেয়ে ছিলুম, আমার গায়ের গন্ধে আপনার নাকি নেশা লাগতো, কিন্তু আমারও যে চোখ খুলতো সে-খবর আপনি রাখেননি। যাক্‌গে সে কথা। আমি বলি আপনার বাইরের দেখাটা সত্য, কিন্তু ভেতরের দিকে আপনার চোখটা

নেই। এবারে দীর্ঘ পাঁচ মাস ধ'রে আপনাকে দেখলুম, বৈশাখ থেকে আশ্বিন,—বেশ দেখলুম, বাইরেটাই আপনার অপরাধ করে, নোংরা ঘাঁটে, কিন্তু ভেতরটা নয়। তোষামোদ মনে করবেন না, আমি অত্যন্ত অহঙ্কারী ব'লেই সত্যি কথা বলি। বাইরেটা আপনার কঠিন বর্বরতা দিয়ে ঢাকা, কিন্তু একটা দুর্বলতার ছিদ্র আছে সেটা আপনারও চোখে পড়ে না।

বলিলাম, কি রকম?

মৃন্ময়ী বলিল—বৃষ্টি ধ'রে গেছে, চলুন আর একদিন হবে। ওকি, ছেলেমানুষী করবেন না।

সে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেই শক্ত করিয়া তাহার হাতখানা ধরিলাম। বলিলাম, বলো কি বলছিলে!

মৃন্ময়ী হাসিমুখে বলিল, টাকা ক'টা দিন আমি যাই। রাত হোলো যে?

অধীর হইয়া বলিলাম, দেব না টাকা, আগে বলো।

বা রে, এ অভ্যেসও বুঝি আপনার আছে? গড়ের মাঠে অন্ধকারে গাছতলায় এনে মেয়েমানুষের কাছ থেকে টাকা ছিনিয়ে নেওয়া?

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে আমি বলিলাম, তার চেয়েও মন্দ অভ্যেস আমার আছে। আমার এই ধুতি পাঞ্জাবীর নীচে যে-দানবের বাসা, তাকে তুমি এখনো চেননি।—বলিতে বলিতে অন্ধকারে

আমার চোখ জ্বলিতে লাগিল, তাহার শান্ত নরম হাতখানা ধরিয়া আমারই বজ্রমুষ্টি অতিশয় উত্তেজনায় কাঁপিতে লাগিল—, পুনরায় বলিলাম, আজকে যাবার আগে তোমাকে ব'লে যেতেই হবে কোথায় আমার সেই ছিদ্র।

অদ্ভুত একটি স্নেহের হাসি মৃন্ময়ীর প্রসন্নমুখে ফুটিয়া উঠিল। শান্ত নিরুদ্বিগ্ন কণ্ঠে সে কহিল, আচ্ছা বলছি, আগে ছাড়ুন হাতখানা? আসুন এদিকে, বেড়াতে বেড়াতে বলি।—এই বলিয়া ধীরে ধীরে সে হাতখানা ছাড়াইয়া লইল।

বেড়াইতে বেড়াইতে সে পুনরায় তাহার বাঁ হাতখানি দিয়া আমার ডান হাতের নড়াটা ধরিল। মধুর কণ্ঠে কহিল, সেই তেরো বছরের বালক আপনি, তেমনি জেদী, তেমনি উচ্ছ্বাসভরা। সংসারে কিছুই যখন আপনি পরোয়া করেন না, দস্যুবৃত্তির ভাঙনে আপনি যদি সব লণ্ডভণ্ডই করতে চান্, তবে আমার এই সামান্য কথাটা শুনতে এত আগ্রহ কেন? যার আত্মবিশ্বাসের মূলে সংশয়ের বিষ ঢালা, তার মুখে এত বড়াই কিন্তু বেমানান।

আমি এতক্ষণ পরে হাসিলাম। বলিলাম, ওঃ এই তুমি বলতে চাইছিলে, তারই এত ভণিতা? হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ। বেশ, আমি বাধিত। আমার আত্মবিশ্বাসের মূলে সংশয়? একবিন্দুও নয়। জানো, আমি কতজনের সর্বনাশ করেছি?

মৃন্ময়ী বলিল, তারা বোধ হয় পুরুষ নয়, মেয়েমানুষ।

আমি তাহার দিকে চাহিলাম। সে কহিল, মেয়েরা সর্ব-নাশের প্রতিশোধ নেয় না, পুরুষের অপরাধ তারা নিজের চোখের জলে মুছে দেয়। কেন জানেন? সকল পুরুষের জন্মই তাদের গর্ভে।

চলিতে চলিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। মৃন্ময়ী পুনরায় কহিল, বর্বরের লোহার চাকা আমাদের বুকের ওপর দিয়ে সহজেই চ'লে যায়, তার কারণ, পথটা ত' দুর্গম নয়, স্নেহে মসৃণ। কিন্তু তাদের দুরন্তপনাকে যদি ক্ষমাই না করতে পারবো তবে মেয়েমানুষ হলুম কেন?

মনে হইল তাহার চোখে জল আসিয়াছে। মাঠের প্রান্তে দেওদারের মাথার উপর কৃষ্ণকায়া রাত্রির কপালে তারাদলের দিকে আমার চোখ পড়িল। যে-কারণে তাহার চোখে এই অশ্রুর আভাস তাহা ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য নহে, এই পথবাসিনী তরুণী নিজের দুঃখ ও দুর্যোগ ভুলিয়া বিশ্বের সমগ্র নারীজাতির অন্তরের বিচার এইভাবেই করিয়া চলিয়াছে। পুরুষের অনাচারের প্রতি তাহার এই অসীম বাৎসল্যের অত্যাশ্চর্য প্রকাশ দেখিয়া আমি কেবল বিস্মিত হইলাম না, উপরে ওই তারকার জাজ্জ্বল্যমান চক্ষে তৃষ্ণাতুরা নিশীথিনী যেমন করিয়া কাঁপিতেছে, আমিও অমনি করিয়া থরথর করিতে লাগিলাম। প্রবৃত্তির শতপাকে সহস্র গ্রন্থিতে নিজেকে আমি জড়াইয়া রাখিয়াছি, বাসনার

অগ্নিকুণ্ডে ইন্ধন যোগাইয়া চলাই আমার নিত্যকর্ম-পদ্ধতি, কিন্তু আজ যে-নারী আমাকে অসীম ব্যাপ্তির দিকে টানিয়া লইয়া যাইবার জন্য আমার বন্ধনগ্রন্থি কাটিতে লাগিল, তাহাকে অভিনন্দন জানাইবার ভরসা পাইলাম না,—চারিদিকে নিরাশ্রয় অকূল সমুদ্র দেখিয়া ভয় পাইতে লাগিলাম। আমি মনে মনে যেন প্রাণপণে নিজেকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা করিলাম।

ধরা গলায় ধীরে ধীরে বলিলাম, বাড়ী চলো, মৃন্ময়ী।

মৃন্ময়ী শান্তকণ্ঠে কহিল, চলুন।

কিন্তু তাহার যাইবার লক্ষণ না দেখিয়া আত্মবিস্মৃত হইয়া চলিতেই লাগিলাম। কিছুদূর গিয়া সে কহিল, রোগের একটি বীজাণু শরীরের সমগ্র রক্তকে দূষিত করে, মানেন ত?

বলিলাম, মানি।

মৃন্ময়ী পুনরায় কহিল, উপমাটি উল্‌টে নিন। একবিন্দু পুণ্য সমস্ত পাপকে ধ্বংস করার পক্ষে যথেষ্ট, এও আপনাকে মানতে হবে।

কিন্তু আমি যে চিরজীবন নোংরামি ক'রে এসেছি, মৃন্ময়ী?

মৃন্ময়ী বলিল, কোন ক্ষতি হয় নি।

কী বলছ তুমি?

বলছি, মানুষ সত্যিই অমর, এ আপনি বিশ্বাস করুন। উপরের দিকটা প'চে গ'লে ক্লেদাক্ত হয়ে গেছে, কিন্তু ভিতরের দিকে চেয়ে দেখুন অগ্নিঋষি আগুনের কুণ্ডে ধ্যানে ব'সে রয়েছেন, তাঁর মৃত্যু নেই। বারে বারে দাউ দাউ ক'রে জ্ব'লে উঠে তিনি জ্বালিয়ে দেন সকল বাহ্য অপরাধ আর স্খলন-পতন। ভয় কি ? আপনার আত্মবিশ্বাসের মূলে যে-সংশয়ের ছিদ্রপথ, সেই পথেই যে মহৎ চিন্তার আনাগোনা। মানুষ কখনো মরে ? সে যে দেবতা! ক্লেদক্লিন্ন, বীভৎস, লোভলালসা-জর্জর, দুষ্টব্যাধি-গ্রস্ত,—সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে সেই দেবাত্মা এক সময় দেব-সেনাপতির মতন বেরিয়ে পড়ে।—মৃন্ময়ী বলিতে লাগিল, এ আমি দেখেছি, যে-বস্তিতে আমি জন্তুর মতন লুকিয়ে থাকি, তার চারিদিকে দেখেছি এর নিত্য উদাহরণ। মানুষ নশ্বরও নয়, মানুষ পাপীও নয়।

কেমন যেন ভারাক্রান্ত মনে দুজনে সেদিন-মাঠের পথ ছাড়িয়া রাজপথের উপরে আসিয়া পড়িলাম। পথের আলো, গাড়ী-ঘোড়া ও জনসমারোহ দেখিয়া আমি যেন কূল কিনারা খুঁজিয়া পাইলাম। হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

মৃন্ময়ী এতক্ষণ পরে সহজ কণ্ঠে হাসিল। বলিল, শাস্ত্রে বলেছে, মোহিনী-মায়া, আপনি এতক্ষণ তারই প্রভাবে পড়ে-ছিলেন, না রাজেনবাবু ?

আমিও হাসিলাম। বলিলাম, মোহিনী-মায়া নয়, এতক্ষণ ভূতে ধরেছিল। এ ভূত আমাকে ছাড়াতেই হবে।

ছাড়ালেই পালাবে, ভয় নেই। কিন্তু সাবধান, আর যেন আঁদাড়ে-অন্ধকারে বেরোবেন না, তাহ'লেই আবার ধরবে।

গাড়ী ভাড়া করিয়া দুজনে চড়িয়া বসিলাম। মৃন্ময়ী বলিল, যাই বলুন, মেয়েমানুষ আরাম চায়, গাড়ীর গদিতে ব'সে বাঁচলুম। চলুন, আপনার যে দিকে খুশি।

হাসিয়া বলিলাম, যদি পাতালপথে নিয়ে যাই?

বেশ ত, কিন্তু মাঝপথে থামতে দেবো না, একেবারে শেষপ্রান্ত পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে।

কেন?

মৃন্ময়ী বলিল, আমি জানতে চাই আপনার ক্ষুধা দুর্বলের নয়, দানবের।

বলিলাম, মৃন্ময়ী, জানাতে তোমাকে পারতুম আমি কী। কিন্তু—

সে কহিল, কী আপনি, শুনি?

আমি? নিজের গুণের কথা নিজের মুখে বলতে নেই। তবু ব'লে রাখি হিংস্র জানোয়ার আর বর্বর দস্যুর একটা সংমিশ্রণ আমার মধ্যে পাই। শুনে ভয় পেয়ো না।

হাসিয়া মৃন্ময়ী বলিল, ভয় পাবো? জানোয়ার যদি হয়

নরসিংহ আর দস্যু রত্নাকর হয় মহাকবি বাল্মীকি, তবে কেমন লাগে ?

বলিলাম, তুমি কি আমাকে কিছুতেই ছোট ক'রে দেখতে পারো না ? একটু ভালোবাসো আমাকে, নয় ?

মৃন্ময়ী সহসা আড়ষ্ট হইয়া গেল। স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। চলন্ত ফীটনের ভিতরে তাহার মুখের চেহারাটা আমি দেখিতে পাইলাম না। এবং তাহার মনোভাব ঠিক বুঝিতে না পারিয়া আমিও একটু যেন সঙ্কুচিত হইয়া গেলাম। ইহা বরাবরই দেখি ভালোবাসার কথা উঠিলেই সে যেন কেমন হইয়া যায়, তাহার চেহারাটা পাষাণের মতো হইয়া আসে। হয়ত একথা আমার ন্যায় মহাপুরুষের মুখে সে শুনিতে চাহে না।

কিছুক্ষণ পরে বলিলাম, হ্যাঁ, যা বলছিলুম। তোমাকে জানাতে পারতুম আমার সত্য চেহারাটা, কিন্তু—

মৃন্ময়ী নড়িয়া বসিয়া সহজ কণ্ঠে কহিল, কিন্তু কেন ?

বলিলাম, বাধা অনেক। ছোটবেলা থেকে তোমাকে জানি, সরোজিনী মাসিমার মেয়ে তুমি, আমরা তোমাদের গ্রামের ঘর জ্বালিয়ে উৎখাত করেছি, বাবার সঙ্গে তোমার স্বর্গতা মায়ের অমন একটা অদ্ভুত প্রণয়ের সম্পর্ক জানতে পারলুম,—বহু কারণে তোমাকে অপমান করতে আমার হাত ওঠেনি। অনেক

সময়ে মনে হয়েছে তোমার সম্ভ্রম রক্ষার একটা দায়িত্বও বুঝি আমার নেওয়া উচিত।

সে বলিল, সেই দায়িত্বরক্ষার জন্যে বুঝি সিনেমার ফাঁদ পেতেছিলেন ?

সিনেমার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কি ?

উষ্ণকণ্ঠে সে কহিল, সিনেমা কোম্পানী খুলে মেয়েছেলেদের নিয়ে কাদা ঘাঁটলেই বুঝি আমার মানরক্ষা হোতো ?

বলিলাম, অবাক করলে তুমি, মৃন্ময়ী। তোমার মান কিসে থাকে আর কিসে যায়, এ ত' আমি বুঝতে পারছিনে ?

বুঝবেন একদিন।

কবে ?

যেদিন আমি থাকবো না। বলিয়া এক ঝলক হাসিয়া মৃন্ময়ী চুপ করিয়া গেল।

উদ্বিগ্ন হইয়া বলিলাম, থাকবে না ? কোথায় যাবে ?

চুলোয়। যেখানেই যাই না কেন, আমার গতিবিধি আপনার শুনে কি লাভ ?

তোমার সঙ্গে এতক্ষণ বেড়িয়েই বা আমার কী লাভ হোলো, বল দেখি ?

মৃন্ময়ী বলিল, আমি না থাকলে এতক্ষণ আপনি অবশ্যই কোথাও নোংরা ঘাঁটতে যেতেন, কিম্বা গিয়ে ঢুকতেন ধর্মতলার

সেই মদের দোকানটায়, কিম্বা কোনো সিনেমা-থিয়েটারের আঁস্তাকুড়ে।

বলিলাম, বলেছ তুমি ঠিক। তবে ওসব জায়গায় লাভ-লোকসান দুই-ই হোতো, সময়ের বাজে খরচ হোতো না।

বড় বড় চোখে চাহিয়া মৃন্ময়ী বলিল, কাল থেকে নিশ্চয়ই আপনার অমূল্য সময় সেইখানেই ব্যয় করবেন?

তা' একরকম বটেই ত'।

মৃন্ময়ী কহিল, কথায় দ্বিধা কেন?

বলিলাম, মেয়েদের কাছে সত্য কথা বলতে দ্বিধা একটু হয় বৈকি।

সে কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিল তারপর বলিল, একটি কথা আপনাকে বলব? কিছু মনে করবেন না?

কথাটা কি জাতীয় শুনি? আমাকে নীতিশিক্ষা দেওয়া?

না। আপনাকে সতর্ক ক'রে দেওয়া।

তাহার কথায় রস পাইয়া সাগ্রহে বলিলাম, সতর্ক ক'রে দেওয়া আমাকে? কি বলো ত'?

মৃন্ময়ী বলিল, আপনি যদি আজ থেকে সমস্ত বদ্ অভ্যেস-গুলো ত্যাগ করতে পারেন তবেই আবার আপনার সঙ্গে আমার দেখা হবে।

সে ত' আমার পক্ষে সম্ভব নয়, মৃন্ময়ী।

তাহ'লে আমাদের এই দেখাই শেষ, রাজেনবাবু।

অতি উত্তম কথা। এই গাঁড়োয়ান—

ক্যা বাবু ?

মৃন্ময়ী উত্তর দিল, কুছ নেই, ঠিক হ্যায়, চলো।

আমি আহত নতমুখে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলাম। তারপর সহসা রুক্ষকণ্ঠে বলিলাম, মৃন্ময়ী, তোমাদের মতন মেয়ে পথে ঘাটে কিনতে পাওয়া যায়, তা জানো ?

মৃন্ময়ী বলিল, যায় কি না জানিনে, যদি যায় তবে একটু বেশি দামই লাগবে। কিন্তু যে কৃপণ আপনি।

কৃপণ বটে, তবে রূপবতী মেয়ের সম্পর্কে নয়।

রূপ কি আর আপনি চিনতে পারেন ? যে-রুচি আপনার !

আমার রুচির উপর কাহারও কটাক্ষ আমি কোনোকালেই সহ্য করিতে পারি না। আমার ভিতরটা একবার কেশর ফুলাইয়া গর্জিয়া উঠিল। কিন্তু এই সামান্যা নারীকে অসম্মান করিতে আমার মন উঠিল না, সাহসেও কুলাইল না। ভীষণ আক্রোশ অতি কষ্টে দমন করিয়া কেবল শান্তকণ্ঠে বলিলাম, রুচির প্রশ্ন তুলে আর কাজ নেই, কারণ তোমার মাকেও জেনেছি, তোমাকেও দেখেছি।

মনে করিয়াছিলাম তাহাকে অপমান করিবার পক্ষে আমার

এই জঘন্য কটাক্ষই যথেষ্ট, কিন্তু আমার বুদ্ধিহীন নির্বুদ্ধিতাটা ইহার অন্য দিকটা বিবেচনা করে নাই। সেই দিক হইতেই মৃন্ময়ী এক কথায় আমাকে একেবারে পথে বসাইয়া দিল। হাসিমুখে বলিয়া উঠিল, আমার মায়ের স্বাভাবিক কাল্‌চার আর রুচি অতি উঁচুদরের ছিল, সেইজন্য তিনি আপনার বাবার মতো একজন রূপবান আর শিক্ষিত ব্যক্তির প্রতি আসক্ত হয়েছিলেন। আপনার বাবা ছিলেন সাধারণ পুরুষ। যদিও আপনারা আমাদের ঘর জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন, এবং সে আপনার মায়েরই হুকুমে, কিন্তু আমার মা জানতেন আপনার বাবা তাঁর কত আপন, কত আদরের। আর আমার রুচির কথা? আমার অবশ্য আপনি নিন্দে করতে পারেন তবে—

মৃন্ময়ী উচ্ছল হাসি হাসিয়া তাহার বাকী কথাটুকু প্রকাশ করিল।

মার খাওয়া কুকুরের মতো শেষ কামড় না দিয়া আর থাকিতে পারিলাম না। দুর্বলের মুখে যে কথাটা সর্বাগ্রে আসিয়া হাজির হয় তাহাই প্রকাশ করিলাম, বেশ, তোমাদের রুচি না হয় খুব উন্নত মানলুম। কিন্তু নীতি-দুর্নীতির দিক থেকে? সেদিক থেকেও কি তোমরা সীতা-সাবিত্রী?

মৃন্ময়ী কহিল, ভূতের মুখে রাম নাম! সীতা-সাবিত্রী আমরা না হই, দ্রৌপদীও ত' বটে। দেবী হিসাবে দ্রৌপদীই বা কম

কিসে ? সত্যিকার ভালবাসার ব্যাপারে নীতি-দুর্নীতি বড় কি না জানিনে, তবে—

তবে কি, বলো ?—আমার আগ্রহ বাড়িয়া গেল।

মনের কথা যদি বলি আপনার ভাল লাগবে না।

বলিলাম, মৃন্ময়ী, মনের কথা যদি কঠোর হয় হোক, কিন্তু সত্য হ'লেই ভাল লাগবে।

মৃন্ময়ী বলিল, জানি মেয়েমানুষ ভালবাসার কাঙাল। এও জানি নিরাশ্রয় মেয়েমানুষের মন স্নেহের আশ্রয় চেয়ে বেড়ায়, কিন্তু ভালবাসার ব্যাপারটায় খুব একটা বড় মহিমা আছে ব'লে আমি মনে করিনে। জীবনে এর দাম বড় কম।

তোমার কথার অর্থ কি, মৃন্ময়ী ?

গাড়ীর বাহিরে পথের দিকে চাহিয়া মৃন্ময়ী বলিল, এই ধরুন, আমার জীবনটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের, কিন্তু যে দুঃখটা নেই, সেই দুঃখকেই ঘরে ডেকে আনবো এমন ভুল কখনো যেন না করি। আমার পথের জীবন যেন পথেই শেষ হয়ে যায়।

আমি সহসা তাহার কাঁধের উপর হাত রাখিয়া বলিলাম, মৃন্ময়ী, পৃথিবীতে সকলের বড় সত্য যা, তাকেই তুমি জীবনে অস্বীকার করতে চাও ?

আমার হাতখানা ধীরে ধীরে আমারই কোলের উপর ফিরাইয়া দিয়া মৃন্ময়ী বলিল, আমার জীবন খুব সামান্য, আসন

যারা দেশের দুর্গম অন্ধকারে উপবাসে শীর্ণ, যারা ব্যর্থপ্রাণ, ক্ষয়ক্ষীণ—আমি যেন এদের সবার কিছু উপকার ক'রে যেতে পারি। যদি নাও পারি কিছু, তবে তাদের জন্যে আমার চোখের জলের অভাব কোনোদিন যেন না হয়।

আমাদের গাড়ী চওড়া রাস্তা ছাড়িয়া সরু পথে হাটবাজারের ভিড়ের ভিতর দিয়া প্রায় আসিয়া পড়িয়াছে। সেই নোংরা বস্তির কাছে মৃন্ময়ীকে নামাইয়া দিতে হইবে এই কথা এতক্ষণ পরে মনে পড়িতেই আমি আড়ষ্ট হইয়া উঠিলাম। তাহার এই হতশ্রী জীবনযাত্রাটা যেন আমারই আত্মসম্মানবোধকে বারম্বার আঘাত করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার সহিত আমার সম্পর্কটা এমনই অসম্ভব যে, নিরুপায় হইয়া আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

কাছাকাছি আসিতেই মৃন্ময়ী হাসিয়া বলিল, আপনার সিনেমা কোম্পানীতে চাক্‌রী নিতে গিয়েছিলুম একথা মনেই ছিল না,—আমাকে গিয়ে এখুনি রান্না ক'রে দিতে হবে, তা জানেন? —এই বলিয়া সে গায়ের কাপড় সংযত করিল, কানের দুল খুলিল, মুখের রুজ-পাউডার বেশ করিয়া মুছিয়া ফেলিল, পরে বলিল, চাক্‌রীর লোভে কী সঙই সেজেছিলুম!

বলিলাম, চাক্‌রীর লোভ ত' তোমার ছিল না, আমাকে সৎপথে ফেরাবার আগ্রহ ছিল।

ফেরাতে পারলুম কই,—এই গাড়োয়ান, দাঁড়াও।

গাড়ী থামিতেই তাহার ভ্যানিটি ব্যাগ তুলিয়া বলিলাম, তোমার টাকা নিয়ে যাও, মৃন্ময়ী।

মৃন্ময়ী নামিয়া গিয়া কহিল, টাকা? টাকা আমার কী হবে?

বলিলাম, সে কি, তোমার ভাই-বোনরা, সন্তানরা—

গাড়ীর ভিতর মুখ আনিয়া সে হাসিমুখে বলিল, আপনিও ত' তাদের দেশের লোক, ও-টাকা আপনাকেই দান করলুম। তা' ছাড়া টাকা যে আপনার বড় প্রিয়।

আহত হইয়া বলিলাম, কিন্তু তোমার টাকায় আমার কোনো অধিকার নেই, মৃন্ময়ী!

মৃন্ময়ী বলিল, বেশ ত', লুঠ-করা টাকা ডাকাতিতেই খরচ করবেন। আপনিই ত' বলছিলেন টাকা খরচ করলে আমার মতন মেয়ে পথে ঘাটে কিনতে পাওয়া যায়। ওই টাকায় তাদেরই কিনবেন।

আমি অপমানিত মুখে স্তব্ধ হইয়া রহিলাম, মৃন্ময়ী মুখ ফিরাইয়া সেই ইতর বস্তিটার অন্ধকার সুড়ঙ্গপথে অদৃশ্য হইয়া গেল। আমার গাড়ী ফিরিয়া চলিল।

৬

রাত্রে ঘুম ভাঙিয়া গেল। ঘরে আলো নাই, অন্ধকারের ভিতরে চারিদিকে আমার দৃষ্টি ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। অনেকদিন এমন হইয়াছে, রাত্রে হঠাৎ উঠিয়া কিছু টাকা হাতে লইয়া বাহির হইয়া গিয়াছি, পিতামাতাকে গ্রাহ্য করি নাই, আবার হয়ত রাত্রিশেষে ফিরিয়া নিঃশব্দে নিজের ঘরে ঢুকিয়া আমার চৌর্যবৃত্তিকে গোপন করিয়াছি। আমার ক্ষণপ্রবৃত্তিতে ইন্ধন যোগাইয়া একরূপ আসুরিক আনন্দেই আমি প্রজাপতির মতো ঘুরিয়া বেড়াইতাম।

আজ গুপ্ত অন্ধকারের তলায় লুকাইয়া সহসা প্রশ্ন করিলাম, আমার কি হৃদয় আছে? মৃন্ময়ী আত্মদান করিতেছে, তাহাকে গ্রহণ করিতে পারিতেছি না কেন? লুব্ধ বাসনা লইয়া তাহার নিকট গিয়া দাঁড়াইতেছি, হাসিমুখে সে অভ্যর্থনা জানাইতেছে; কিন্তু রূপ-যৌবনের প্রতি আমার স্বাভাবিক ক্ষুধা কেমন করিয়া হারাইলাম? যাহাকে পাইবার জন্য আমার কোনো পরিশ্রম অথবা উদ্বেগ নাই, স্বেচ্ছায় আসিয়া যে আমারই নীড়ে আশ্রয়

লইতেছে, তাহাকে পাইতে গিয়া আমার বিবেকে বাধে কেন? তবে কি আমার হৃদয় আছে?

কিন্তু অন্ধকার রাত্রির নৈঃশব্দ আমার প্রশ্নের জবাব দিল না, নিজের বুকের ভিতরেও আমি যেন কেমন একটা ঘন অন্ধকারের গুরুভার উপলব্ধি করিলাম। আমি নিজে কোনো-দিন কাহারও ভালো করি নাই, কিন্তু আমার জন্য একটি নারী নিশিদিন কল্যাণ কামনা করিতেছে, ইহা ভাবিতে গেলেই আমি যেন যন্ত্রণা অনুভব করি। স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারের ভিতরে থাকিয়া আমার এমনই হইয়াছে যে, ভালোবাসার বাঁধনে ধরা দিতেও আমার বুকের ভিতরটা ভয়ে কাঁপিতে থাকে। আমার কেমন একটা ধারণা আছে, প্রয়োজন হইলে আসক্তিকে বরং ত্যাগ করিতে পারিব কিন্তু হৃদয়ের কোনো মহৎ সুরের ফাঁদে পড়িলে আমার এই শান্তি আর থাকিবে না। অসংযমে কোনো বিপদ্ নাই, ব্যক্তিগত মুক্তির দ্বার সেখানে অবারিত, কিন্তু নারীর সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার সহিত জড়িত হইয়া পড়িলে আমার পলাইবার কোন পথ থাকিবে না। হৃদয় লইয়া কারবার করিলে রাত্রির নিশ্চিন্ত নিদ্রায় আমার ব্যাঘাত ঘটিবে।

কিন্তু এ কোথায় আসিয়া পড়িয়াছি? শরৎকাল চলিয়া গেল, হেমন্তকালের বাতাসে কেমন যেন মৃদু শৈত্য অনুভব করিতেছি। দেখিতে দেখিতে দুই তিন মাস চলিয়া গিয়াছে,

আগেকার জীবন আমার নিকট যেন বিদায় লইবার জন্য চক্ষের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে, আর তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছি না। আমার একটা ছায়া যেন এই অন্ধ ঘরের ভিতরে ওই দেয়ালের কাছে দাঁড়াইয়া গুপ্তঘাতকের ছুরির ফলকের ন্যায় নিঃশব্দে হাসিতেছে। আমি স্তব্ধ হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া দেখি, তাহার মুখে অদ্ভুত বিদ্রূপ, আমি যেন তাহাকে এতকাল ধরিয়া প্রতারণা করিয়াই আসিয়াছি ; আমার সত্তার সহিত তাহাকে যে চিরকালের জন্য মিশাইয়া লইতে পারি নাই, এই ফাঁকি সে যেন আজ ধরিয়া ফেলিয়াছে।

চোখ বুজিয়া পাশ ফিরিলাম।

কিন্তু চোখ বুজিলেই আরও যেন দূরের দিকে দৃষ্টিটা ছুটিয়া যায়। চাহিয়া দেখিলাম চৌরঙ্গীর পথ ধরিয়া চলিয়াছি। মাঠের ভিতর দিয়া মৃন্ময়ী আমার পাশে পাশে চলিতেছে। যে কথাগুলি তাহার নিকট শুনিয়াছি, তাহার অপেক্ষা অনেক বেশি উপলব্ধি করিয়াছি। তাহার ভদ্র মন ও পরিচ্ছন্ন রুচির উপরে কত অত্যাচার অবাধে চালাইয়া গিয়াছি তাহা মনে করিলেও মাথা হেঁট হয়। আমার ভিতরে কোথায় সে একটা বড় সম্ভাবনা দেখিয়াছে যাহার জন্য সে আমাকে পদে পদে ক্ষমা করিতে দ্বিধা বোধ করে নাই। টাকা দিয়া তাহাকে অনেকবার বাঁচাইয়াছি, মনে করিতাম টাকার জন্য সে আমার পিছু পিছু

ছুটিতেছে, কিন্তু সে-ভুলও আমার ভাঙিয়াছে। আমার ন্যায় কৃপণ ও লোভীর নিকট অসঙ্কোচে সে এতগুলি টাকা অম্লান বদনে রাখিয়া দিল, এই টাকা লইয়া আমি যথেচ্ছাচার করিতে পারি জানাইয়া গেল, কিন্তু কোথাও এতটুকু আসক্তি প্রকাশ করিল না।

চোখ বুজিয়া দেখিলাম, মৃন্ময়ী কখন্ হইয়া উঠিয়াছে জ্যোতির্ময়ী। দেখিলাম সে আমার কাছে নাই, অনেক দূরে দাঁড়াইয়া সে যেন স্মিতমুখে আমাকে বলিতেছে, ভয় কি? তোমার বুকের মধ্যে অগ্নিঋষি আগুনের কুণ্ডে ধ্যানে ব'সে রয়েছেন, তাঁর মৃত্যু নেই। বারে বারে দাউ দাউ ক'রে জ্ব'লে উঠে তিনি জ্বালিয়ে দেন সকল বাহ্য অপরাধ, আর স্খলন-পতন। মানুষ কখনও মরে? সে যে দেবতা!

মৃন্ময়ীর দিকে চাহিয়া দেখিলাম, যে-অদ্ভুত কামকল্পনা তাহার সর্বাঙ্গ ব্যাপিয়া আমার লালসা-জর্জর জৈব-প্রবৃত্তিকে ক্ষণে ক্ষণে মাতাল করিয়াছে, কেমন একটা মন্ত্রবলে তাহা দৈবভাবে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। ইহা কি আমারই দেখিবার ত্রুটি? নারীর একই রূপ চিরদিন ধরিয়া পুরুষের চক্ষের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে, কিন্তু তাহা কি সত্যই ভিন্ন রূপ ধারণ করে? কেহ তাহাকে দেবী বলিল, কেহ বলিল কবিতা, কেহ বলিল দানবী, কেহ বা নিতান্ত মানবী বলিয়া তাহাকে

ঘরে তুলিয়া লইল। কিন্তু আমি ত' তাহাকে কোনো আখ্যাই দিই নাই, তাহার কোনো রূপই স্বীকার করি নাই, কেবল আমার দুষ্প্রকৃতির ইন্ধন হিসাবেই তাহাকে ক্রীড়নকের মতোই ব্যবহার করিয়াছি। কিন্তু জ্যোতির্ময়ী যাহাকে বলিলাম সে কেমন করিয়া জ্যোতির্ময়ী হইয়া উঠিল, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। নিজের দৃষ্টির উপর হইতে বাসনার জাল সরাইয়া দেখিলাম, তাহার যে অধরের চারিদিকে আমি ভ্রমরের মতো গুঞ্জন করিয়াছি তাহাতে ফুটিল অমৃতময়ী বাণী, তাহার যে চক্ষে ফুটিতে দেখিয়াছি আমার দুরন্ত স্বপ্নচ্ছায়া তাহা যেন কেমন করিয়া অত্যাশ্চর্য প্রসন্ন স্নেহে পৃথিবীর সকল মানুষের দিকে চাহিয়া আছে, তাহার অপরূপ দেহলতা নমস্যা প্রতিমার মতো মনে হইতে লাগিল। ইহা দৃষ্টিবিভ্রম সন্দেহ নাই, ইহা আমার নিদ্রাহীন রাত্রির বিকার-কল্পনা তাহাও মানিলাম, কিন্তু আজ এমনি করিয়াই তাহাকে ভাবিতে ভালো লাগিল।

সকালবেলা উঠিয়া চারিদিকে চাহিলাম। এমন করিয়া আর কোনোদিন ক্লান্তি অনুভব করি নাই। চোখের দুই পাতায় নিদ্রা জড়িত, কিন্তু ভিতরে মন জাগিয়া থাকিয়া যেন খাঁ খাঁ করিতেছে। তাহাকে ঘুম পাড়ানো সহজসাধ্য নয়।

সকালের হাল্‌কা রৌদ্রের আলো ঘরে আসিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু তাহা বিবর্ণ, আমার জীবনের মতোই অর্থহীন। চিরদিন

আমি সৌখীন, বিলাসী—ঘরের আসবাবসজ্জা তাহারই পরিচয় দেয়, আজ যেন সেগুলি সমস্তই গুরুভার বলিয়া মনে হইল। কি কারণে স্তব্ধ হইয়া এতকাল ধরিয়া যে তাহারা আমার চক্ষের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে তাহার কৈফিয়ৎ খুঁজিয়া পাইলাম না। প্রাণীদের প্রাণ ছিল বলিয়াই তাহাদের চেতনা ছিল, আমার মন ফিরিয়া দাঁড়াইলেই তাহাদের অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যায়।

মনে করিয়াছিলাম কাজ করিব, নিজেকে ভুলাইব, এই একটা অনির্দিষ্ট জীবনে যা' হোক একটা সঙ্গতি আনিব। কিন্তু মৃন্ময়ী সিনেমা-কোম্পানী ভাঙিয়া দিল, আমার সকল কার্য-কল্পনাকে দুই কথায় উড়াইয়া দিল, আমার এই উদ্‌ভ্রান্ত জীবন কেমন করিয়া কাটিবে তাহার কথা সে আদৌ চিন্তা করিল না। আমার সকল দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া একদিকের দুয়ার কেবল খোলা রাখিল। আমি ভালো হইয়া উঠি তাহাই সে চায়, আমি মন্দ হইয়া যাই তাহাতেও সে বাধা দিবে না। আমি যাহা কিছু করিব তাহাই সে নিঃশব্দে চাহিয়া চাহিয়া দেখিবে, আমি অধঃপতনের পথে চলিলে সে আসিয়া নিষেধও জানাইবে না। সুতরাং সকালবেলায় উঠিয়া সর্বপ্রথমে এই চিন্তাই আসিল, আমি মানুষের মতো মানুষ হইব, অথবা প্রবৃত্তির প্রবাহে গা ভাসাইয়া দিব। মৃন্ময়ীর সহিত পুনরায় দেখা হইবার পূর্বে এই সমস্যারই প্রতিবিধান করিতে হইবে।

কিন্তু চা খাইতে নীচের তলায় নামিয়া আসিয়া সম্মুখে যে-দৃশ্য দেখিলাম, তাহাতে তখনই আমার চিন্তার গতি ঘুরিয়া গেল।

সদ্য স্নান সারিয়া একটি তরুণী আমারই জন্য চা প্রস্তুত করিতেছে ইহা কি এক মিনিট পূর্বেও ভাবিতে পারিয়াছিলাম? আমাকে সম্মুখে দেখিয়া মেয়েটি জড়োসড়ো হইয়া বসিল। মাথায় একরাশ এলো চুল, হাতে কয়েকগাছি চুড়ি, পরনে বাসন্তী রংয়ের একখানী শাড়ী—কিন্তু এই কয়েকটির সমন্বয়ে সে যেন তাহার চারিপাশে একটি লাবণ্যের পরিমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছে। তৎক্ষণাৎ আমার নিকট মৃন্ময়ী তুচ্ছ হইয়া গেল, এই তরুণীকে দেখিয়া প্রাণের ভিতরটা আমার আনন্দে আপ্লুত হইয়া উঠিল। একপ্রকার অভিভূত উচ্ছ্বাসে সেখানে আর দাঁড়াইতে না পারিয়া আমি তাড়াতাড়ি মুখ ধুইতে চলিয়া গেলাম।

কাল রাত্রে কাকীমা আসিয়াছেন, অনেক রাত্রে ফিরিয়া ঘরে ঢুকিয়াছি, ইঁহাদের আসার সংবাদ আর জানিতে পারি নাই। মুখ ধুইয়া আসিয়া বসিলাম। মা ও কাকীমা আসিয়া দাঁড়াইলেন।

বলিলেন, রাতে খাওয়া দাওয়া বন্ধ করলি কেন রে? বাপ কি সকলের চিরকাল বাঁচে?

মা আড়ালে দাঁড়াইয়া অশ্রু মুছিলেন। বলিলাম, কাল কখন্ এলে তোমরা, কাকীমা?

এসেছি কাল বিকেলে। দিদির কাছে শুনলুম তোর আজকাল চুলের টিকি দেখবার যো নেই। কি করিস সারাদিন ?

আড় চোখে তরুণীটির দিকে চাহিয়া লইলাম। মনে হইল, আমার কাজের হিসাব শুনিবার আগে প্রচ্ছন্ন একটি হাসির রেখা গোপনে তাহার অধরে মিলাইয়া গেল। ভয়ে আমার বুকের ভিতরটা ধক্ করিয়া উঠিল। পিতৃশোকে আমি যে অধীর হইয়া আছি তাহা কি সে বিশ্বাস করে না, সে কি আমার গতিবিধির সংবাদ রাখে ?

বলিলাম, কাকীমা, বাবা এমন অবস্থায় গেছেন যে, তাঁর বিষয়পত্রের কোনো হদিশ পাইনে। কোথায় কি আছে, কোন দলিল কা'র কাছে, কিছুরই ঠিকানা নেই। সারাদিন আমাকে ছুটোছুটি করতে-হয়।

কাকীমা বলিলেন, কত খবরই তোর নামে পাই, কোনোটা আজগুবী, কোনোটা অদ্ভুত। বিয়ে না করলে মন্দ কথা রটানোর লোকের অভাব নেই। একে চিনতে পারিস ?

বলিলাম, কই না ?

ওমা, ভুলে গেলি ? এর নাম আন্নু। ভালো নাম কি যেন বাপু মনেও থাকে না। ন' বছর বয়সে একবার এসেছিল আমার সঙ্গে। আমার মেজভা'য়ের মেয়ে রে।

হাসিয়া বলিলাম, কাকীমা, ফ্রক্ ছেড়ে শাড়ী পরলেই মেয়েদের চেহারা বদলায়।

কাকীমা বলিলেন, বাবা, কত কথা জানিস তুই।

আন্নু অতি কষ্টে হাসি চাপিয়া আমার হাতের কাছে এক পেয়ালা চা রাখিয়া পলাইয়া গেল। বুঝিলাম, ফ্রক্ ও শাড়ীর তুলনা শুনিয়া সে তাহার উচ্ছল হাসি আঁচলে চাপিয়া সেখান হইতে সরিয়া পড়িল।

কাকীমা এবার প্রশ্ন করিলেন, রাজেন, তুই নাকি বাবা, সিনেমা কোম্পানী খুলছিস।

বলিলাম, ক্ষতি কি, কাকীমা?

ওমা, ছি ছি, সেখানে যে শুনেছি স্বভাব চরিত্র ভালো থাকে না, বাবা।

এবারে হাসিয়া বলিলাম, ভয় নেই কাকীমা, যে-নিয়মে সিনেমা কোম্পানী আরম্ভ হয়েছিল, সেই নিয়মেই তার মৃত্যু ঘটেছে।

বাঁচলুম শুনে।—কাকীমা বলিলেন, তোর মতন দেবচরিত্র ছেলে কি বাবা ওই সব নোংরা ঘাঁটতে যায়।—পরে গলা নামাইয়া বলিলেন, কাঁচা পয়সা হাতে থাকলে পাঁচজনে পাঁচ রকম পরামর্শ দেয়।

বলিলাম, তোমরা থাকবে ত' এখন কিছুদিন? মা ত'

আমার সঙ্গে বিশেষ বাক্যালাপ করেন না। তিনি স্বামী-শোকে অধীর।

মা আড়াল হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। হাসিমুখে বলিলেন, মুখপোড়া, কথা কইনে? খাবার আগলে ব'সে থাকি দিনরাত, থাকিস কোথায় তুই সারাদিন শুনি? আমি ত' এখনো মরিনি।

বলিলাম, বাড়ীতে থাকবার জো নেই, বুঝলে কাকীমা? মা'র ওই এক কথা, কবে বিয়ে করব!

কাকীমা বলিলেন, আহা, তা' বলবে বৈ কি বাবা। তোরা না হয় বাইরে থাকিস, মন থাকে নানা দিকে, বাড়ীর গিন্নী পাঁচটা ছেলেপুলে বৌ-ঝি না থাকলে কখনো থাকতে পারে?

তার মানে, তুমিও বলতে চাও বিয়ের কথা।

অলক্ষ্যে দেখিলাম, মা ও কাকীমার চার চক্ষে মিলন ঘটিল। কাকীমা বলিলেন, তুই ত বরাবর ব'লে এসেছিস, ভালো মেয়ে পেলে বিয়ে করতে তোর আপত্তি নেই, এখন তবে কাটিয়ে দিস কেন?

আমার কি বিয়ের বয়স হয়েছে, কাকীমা?

কাকীমা হাসিলেন এবং মা আমাকে মুখপোড়া বলিয়া চলিয়া গেলেন। আমিও চা খাওয়া শেষ করিলাম।

সকালবেলা কোনও কালেই আমি বাড়ীতে থাকি না।

রাত্রিটা কি ভাবে কাটাইব তাহারই বন্দোবস্ত করিবার জন্য সকালবেলা টাকা পয়সা পকেটে লইয়া আমি সাধারণত বাহির হইয়া পড়ি। দুপুরে ফিরিয়া দিবানিদ্রা এবং সন্ধ্যার সময় ফিট্‌ফাট্ হইয়া বাহির হইয়া যাওয়া। আগে ভাবিতাম আমার জীবনে বৈচিত্র্য আছে কিন্তু বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে এমন এক অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছি, যেখানে দাঁড়াইয়া জীবনের চেহারাটা বিবর্ণ বলিয়াই বোধ হয়। নূতন নূতন স্বাদ লইতে গিয়া জিহ্বা আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছে, সেখানে আর কোনও চেতনা নাই।

নিজের ঘরে আসিয়া ঢুকিতে গিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলাম। আমার ঘরে কোথাও বিশৃঙ্খলা আছে তাহা আমি জানিতাম না, অন্যে কেহ জানে ইহা বিশ্বাসও করি না। কিন্তু আন্নু বলিয়া যে মেয়েটিকে কাকীমা আমার নিকট পরিচিত করিলেন, এখন আসিয়া দেখিলাম সেই তরুণীটি আমার ঘরে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছে। ব্রহ্মচারীর শয়ন-মন্দিরে সুন্দরী তরুণীর আবির্ভাব অপ্রীতিকর অবশ্যই নয়, কিন্তু ভিতরে ওই একটি মুহূর্তের জন্য মুখ বাড়াইয়া যাহা চক্ষের নিমেষে দেখিলাম, তাহা এই সকালবেলায় খুবই ভালো লাগিল। তাহার হাতের ছোঁয়ায় আমার বিশৃঙ্খল সাজ আসবাবের সমস্ত চেহারাটাই একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে।

আমাকে দেখিয়া আন্নু একটু জড়োসড়ো হইল। এ যাবৎ

যে সকল নারীর সান্নিধ্যলাভ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছে, তাহারা আর যাহাই হউক, লজ্জায় সঙ্কুচিত হয় নাই, বরং অভ্যর্থনা করিয়া কাছেই ডাকিয়া লইয়াছে। মৃন্ময়ীকে প্রথম যখন দেখিলাম, সে ছিল যুদ্ধের ঘোড়া, তাহার ভয় ডর নাই, চক্ষুলজ্জা মানে না, অবাধে আমার সহিত একান্ত অসঙ্কোচে বাক্যালাপ করিয়াছে। কিন্তু ইহা কিরূপ? বাঙালী গৃহস্থের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে যে-মেয়েটি মানুষ হইয়াছে, পৃথিবীর কোনো অভিজ্ঞতা, আনন্দ-বেদনার সহিত যাহার আজিও কোনো পরিচয় ঘটে নাই, তেমনি একটি নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক কুমারীকে দেখিয়া আমি যেন কেমন একটি নিগূঢ় আনন্দ অনুভব করিলাম। মুখে বলিলাম, যার ঘর এমন ক'রে গুছিয়ে দিলে, কই, সে মানুষটার সঙ্গে আলাপ ত' করলে না?

আনু মুখে আঁচল চাপা দিল।

বলিলাম, নামটি ত' শুনলুম, ভালো নামটি ত' কেউ বললে না?

এবার সে কথা কহিল, বলিল, আমার নাম মণিমালা।

বলিলাম, জানো, এমন ক'রে ঘর গুছিয়ে দিলে লোকে তোমাকে তামাসা করতে পারে?

মণিমালা বলিল, কাল সন্ধ্যেবেলা আপনার ঘর গুছিয়ে দিয়েছি, আপনি লক্ষ্য করেন নি।

বলিলাম, বলো কি, এমন একটা দুর্লভ সেবা সম্পূর্ণ অলক্ষ্যে হয়ে গেল? এখানে থাকবে ত' কিছুদিন?

সে আর আমার মুখের দিকে চাহিতে পারিল না। তাহার আপন ব্যক্তিত্ব কিছু নাই, ইহা সে নীরবে থাকিয়াই আমাকে জানাইয়া দিল। আমি তাহার পড়াশুনার কথা জিজ্ঞাসা করিব ভাবিতেছি, কিন্তু আমার উপস্থিতিতে সে এতই অধীর হইয়া উঠিয়াছিল যে, আর দাঁড়াইতে পারিল না, আমার পাশ কাটাইয়া একটি মাধবীলতার মতো আঁকিয়া বাঁকিয়া ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল।

৭

মণিমালা চলিয়া যাইবার পর আমিও প্রাত্যহিক অভ্যাস-মতো বাহির হইব ভাবিতেছিলাম, এমন সময় কাকীমা আসিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইলেন।

বলিলেন, বাবা, দু' একদিনের জন্যে আমি এসেছি, আমার কথার অবাধ্য হোয়ো না।

বলিলাম, বলো না কি বলছ, কাকীমা ?

বলছি, আর তুমি অমত করতে পারবে না। এই মাঘেই এ কাজটি সেরে ফেলা চাই।

বিয়ে ? প্রশ্ন করিলাম।—মেয়ে কই ?

তিনি বলিলেন, মেয়ের ভাবনা কি ? আনুকে তবে আনলুম কি জন্যে ?

বিস্মিত হইয়া বলিলাম, আনু, মানে তোমার মণিমালা ?

কাকীমা হাসিমুখে বলিলেন, হ্যাঁ রে হ্যাঁ, মণিমালা।

তা কেমন ক'রে হবে ? কী যে বলো তোমরা ?

কেন রে, আনুকে পছন্দ হয় না ?

বলিলাম, ওদিক থেকে কোনো কথা ভাবিনি, কাকীমা। কিন্তু সে কেমন ক'রে হবে ?

কাকীমা ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া চেয়ারে আসিয়া বসিলেন। তাঁহার বসার ভঙ্গী দেখিয়া মনে হইল, আপাতত তিনি উঠিবেন না, একটা কিছু নিষ্পত্তি তিনি করিতে চান। আমিও কেমন যেন ভয় পাইয়া গেলাম। নিজের সকল রূপই কল্পনা করিতে পারিতাম, কিন্তু একটি নারীকে লইয়া বিবাহিত জীবন যাপন করিতেছি, আমার বহুমুখিনী কল্পনা এই পথ মাড়াইয়া কিছুতেই চলিতে পারিত না। ভয় করিত এই কারণে যে, এমনি একটা নির্দিষ্ট জীবনে আমি যেন আমার মৃত্যুকে দেখিতাম, যেন আমার সকল মানবতার বিকাশ ওই একটা বিশেষ অবস্থার পিঞ্জরে আটকাইয়া স্তম্ভিত ও অবরুদ্ধ হইয়া গিয়াছে,—ইহারই একটা অস্পষ্ট ও ভয়াবহ চেহারা ভাবিয়া আমি মনে মনে কেমন যেন শিহরিয়া উঠিতাম। আমি বিবাহ করিব, প্রচলিত সংস্কার ও প্রথাকে অনুসরণ করিয়া এক অপরিচিতাকে ঘরে আনিয়া সকলের চোখের উপর বসিয়া স্বামী-স্ত্রীর ভূমিকা অভিনয় করিব—এই কথাটা ভাবিলেই আমার হাসি পাইত, নিজের এইরূপ অবস্থাটা আমি কোনোমতেই ভাবিতে পারিতাম না।

কাকীমা বলিলেন, হতে পারে না কেন রে ?

তা জানিনে কাকীমা, কিন্তু এ অসম্ভব।

কাকীমা বলিলেন, বলতে নেই বাবা ওসব কথা, লোকে মন্দ বলবে। তুমি একটি মাত্র ছেলে, বিয়ে না করলে কি হয় বাবা? আন্নুকে ত দেখলি, ও কি তোর অযোগ্য?

চুপ করিয়া রহিলাম। কোন্ মেয়ে যোগ্য, অথবা কোন্ মেয়েটি অযোগ্য—ইহা আমি বিচার করি নাই। উহাদের দিক হইতে স্বাতন্ত্র্যের কথা, যোগ্যতার কথা কিছুই চিন্তা করি নাই। পুরুষের জীবন-যজ্ঞে উহারা উপকরণ মাত্র—উহারা বিভিন্ন চেহারায় একই ধাতু, একই বস্তু,—ইহাই ভাবিয়া আসিয়াছি। পুরুষের মন ভুলাইবার জন্য উহাদের অনেকেই অধুনা আধুনিক বুলি আওড়াইয়া কালোপযোগী হইয়া উঠিতেছে এইটুকু মাত্র জানিয়া আসিয়াছি, ইহার অধিক জানিবার অথবা ভাবিবার প্রয়োজন বোধ করি নাই। সুতরাং মণিমালা আমার যোগ্য হোক অথবা নাই হোক তাহাতে আমার কিছু যায় আসে না। আমার নারীকে প্রয়োজন এবং নারীকে করতলগত করিতে পারিলেই আমি আর কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ করিতাম না।

কাকীমা বলিলেন, আন্নুর গুণগান আমি করব না, আমি জানি বাবা, তোর নিজের চোখ আছে। শুধু জিজ্ঞেস করি, তুই কেমন মেয়ে চাস?

মুখ তুলিয়া বলিলাম, এত সহজে শুনে নিতে চাও, কাকীমা?

সহজ কথাই তো বাছা। ভদ্রঘরের সাধারণ একটি সুশ্রী মেয়ে পাওয়া কি যেমন-তেমন কথা? তোর সুখে-দুঃখে, আপদে-বিপদে তোকেই আগলে রাখবে—এর চেয়ে ভালো, এর চেয়ে বড় আর তুই কি চাস?

হাসিয়া বলিলাম, কি চাই এখনি বলা ভারি কঠিন।

আচ্ছা, সময় দিলুম, ভেবে বলবি। লেখাপড়া আনু বেশ ভালোই জানে। অবশ্য এমন লেখাপড়া জানে না যাতে সে তোকে রোজগার ক'রে খাওয়াতে পারবে।

আমি আবার হাসিলাম। কাকীমা মুখের একটা শব্দ করিয়া তখনকার মতো উঠিয়া বাহির হইয়া গেলেন। আমি নিষ্কৃতি পাইয়া বাঁচিলাম।

বাঁচিলাম বটে, কিন্তু এ যেন একটা নূতন সমস্যা দেখা দিল। বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া এইরূপে আমার উপর উৎপাত করিলে আমি বাঁচিব কেমন করিয়া? চট করিয়া আর কোনোদিকে না চাহিয়া খামোকা বিবাহ করিয়া ফেলিব, এত বড় অধঃপতন কি আমার সত্যই হইয়াছে? আমার দুর্গতি আর কতদূরে পৌঁছিবে? অথচ কাকীমার কথাটাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিবার যো নাই। বিবাহ করিব না, এত বড় কারণ আমার জীবনে কি কিছু আছে? অথচ বিবাহ করিতে গেলে পাত্রীর যোগ্যতার পক্ষে যাহা কিছু প্রয়োজন তাহা মণিমালার একরূপ সমস্তই

রহিয়াছে। অপছন্দ করিয়া এড়াইয়া যাইব তাহার কোনো সুবিধাই নাই।

এই ভাবিয়াই আমার ভয় হইতে লাগিল যে, সমস্ত অবস্থাটা মিলিয়া আমাকে যেন সৎপথে আনিবার চেষ্টা করিতেছে। আমি যে অসৎ প্রকৃতির মানুষ ইহা আমি যতটা জানিতে পারি নাই, অন্য সকলে আমার আগেই যেন বেশি করিয়া জানিয়াছে। বস্তুতঃ মহৎ স্বভাবের মানুষ আমি জীবনে খুব অল্পই দেখিয়াছি, কারণ, খবরের কাগজ পড়িয়া আর জনসাধারণের মুখে শুনিয়া যাহাদের মহৎ ব্যক্তি বলিয়া জানিতাম, তাহাদের অনেকেই ষোল আনা মহৎ নহে ইহা ত নিত্যই সংবাদ পাইতেছি। সুতরাং একজন প্রথম শ্রেণীর ভালো লোক দেখিবার আগে অবধি নিজেকে মন্দ লোক বলিয়া মনে করিতে পারিব না।

মণিমালাকে লইয়া কাকীমা তিন চার দিন অবস্থান করিলেন এবং আমিও এড়াইয়া পলাইয়া বেড়াইতে লাগিলাম। অপরাধ কিছু করি নাই, কিন্তু ইহাদের প্রস্তাবের সঠিক জবাব দিতে না পারিয়া যেন অপরাধী সাজিয়াই আড়ালে আব্ডালে রহিলাম। বিবেক বলিয়া একটা পদার্থের অবশেষ হয়ত তখনও কিছু আমার মধ্যে ছিল, ভিতর হইতে সেই দুঃশীল আমার কানে কানে কহিল, মেয়েটিকে অপছন্দ করিবে এমন যুক্তি তোমার নাই, উহাকে অযোগ্য বলিয়া তাড়াইবার মতো বড় আত্মপরিচয়

তোমারই বা কি আছে? কিছুই নাই তাহা জানি। সত্য কথা বলিতে কি, অমন একটি নিষ্কলুষ কুমারীর নিকট মাথা তুলিয়া কথা বলিবার মতো নিঃসঙ্কোচ সরলতাও আমার নাই। উহাকে দেখিলে শ্রদ্ধায় সম্মানে আমার চক্ষু নত হইয়া আসে—এমন দুর্বলতাও মনে মনে অনুভব করিয়াছি।

কিন্তু তবুও কথা থাকিয়া যায়। উহাকে দেখিলে আমি আকর্ষণ অনুভব করি না, আমার রসকল্পনা বিন্দুমাত্রও জাগ্রত হয় না, মনে হয় উহার আমেজ হইতে পলাইতে পারিলেই নিষ্কৃতি বোধ করি। উহার পাশে মৃন্ময়ীকে কল্পনা করিলে মৃন্ময়ী কেমন যেন আমার নিকট বড় হইয়া উঠে। বিবাহের কথা এখানে বড় নয়, সম্ভবও নয়, মৃন্ময়ী বিবাহের পাত্রীও নয়,—কিন্তু তাহার আচরণে, তাহার মধুর সহৃদয়তায় আমি এমন একটি জীবনের বড় আদর্শের প্রাণক্ষেত্রের আস্বাদ পাই যে, তাহা শত মণিমালার মধ্যেও সম্ভব নয়। সুতরাং আমার বর্তমান সমস্যা এই দাঁড়াইল যে, বিবাহ করিতে আমি অনিচ্ছুক নহি, কিন্তু এমন কোন্ মেয়েকে পাইব যাহার জন্য মৃন্ময়ীর মতো নারীর সহিত অনায়াসে সম্পর্কচ্ছেদ করিতে পারি? মৃন্ময়ীর ভিতরে এমন এক বস্তুর সন্ধান পাইয়াছি, আমার প্রাণের ভিতরে এমন একটা শিকড় গভীরের দিকে নামিয়া গিয়াছে যে, তাহা উপড়াইয়া ফেলিতে গেলে আমার জীবনের অস্তিত্বের মূলেই

হয়ত টান পড়িবে। অথচ মৃন্ময়ীকে যে বিবাহ করিয়া জীবন-সঙ্গিনী করিতে পারিব এমন একটা অদ্ভুত কল্পনা উভয়ের দিক হইতেই সম্পূর্ণ অসম্ভব। কারণ ইহার জন্য সামাজিক ও ব্যবহারিক জীবন একেবারেই ধ্বংস হইবে; মুখ দেখাইতে না পারিয়া মুখ লুকাইবার স্থানও আমাদের জুটিবে না এবং যে সমাজকে না মানিয়া আমরা বিবাহ করিব, সেই সমাজেরই বিভিন্ন আঁস্তাকুড়ের ধারে আমাদের জীবন অতিবাহিত হইবে। আমি ইহাও জানি, মৃন্ময়ী বরং মৃত্যু বরণ করিবে কিন্তু এই অকল্যাণজনক বিবাহে নিজের সম্মতি দিয়া আমাকে বিপদে সে ফেলিবে না।

অবশেষে স্পষ্ট কোনো কথা আমার নিকট হইতে না পাইয়া কাকীমা একদিন মণিমালাকে লইয়া প্রস্থান করিলেন। মণিমালা আমাকে কাহার যেন অলক্ষ্য ইঙ্গিতে প্রণাম করিতে আসিল, আমি বাধা দিলাম। এই প্রণামের অর্থ আমি বুঝিতে পারি। ব্যথায় মন টন্ টন্ করিয়া উঠিল, একটা মস্ত মূল্যবান বস্তু হারাইয়া ফেলিতেছি—একটা অদ্ভুত বেদনাবোধের সঙ্গে এ কথাও মনে হইতে লাগিল। হয়ত ইহার জন্য আমাকে কাঁদিতে হইবে এমন সম্ভাবনাও রহিল, কিন্তু বিদায় না দিয়া উপায় নাই। যাহা সহজে আসিয়া উপস্থিত হয় তাহা যত মূল্যবানই হোক তাহার প্রতি কেমন একটা অহেতুক অনাসক্তি; যাহা পাই নাই,

পাওয়া কঠিন,—মনটা তাহারই পিছনে পিছনে নির্বোধের ন্যায় ছুটিয়া চলে।

তাহাদের বিদায় দিয়া দরজার কাছেই দাঁড়াইয়া রহিলাম। শীতের মধ্যাহ্নে মধুর রৌদ্রের দীপ্তি, তাহারই দিকে চাহিয়া নিজের ভিতরে অনুভব করিলাম, মনে হইল নূতন একটা চেতনা আমার ভিতরে রি রি করিতেছে। পূর্ব জীবনের ব্যথা বেদনা অথবা রসবিলাসের হিসাব নিকাশ নয়, কিন্তু আগামী জীবন সম্বন্ধে একটা ভয়জড়িত ঔৎসুক্য। সম্ভোগে আমি লিপ্ত, প্রবৃত্তি-বিলাসে আমার আজন্ম লালসা কিন্তু অন্তরে অন্তরে সাথী খুঁজিয়া পাইবার এমন একটা নিবিড় কামনা ত' কই আগে জানিতে পারি নাই। স্ত্রীলোককে ঘৃণা করি, তাহার প্রমাণ এই যে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত এতটুকু প্রশ্রয় তাহাদের দিই না ; স্ত্রীলোককে শ্রদ্ধাও করি, তাহার প্রমাণ আমার জীবন-রঙ্গমঞ্চে শ্রীমতী মৃন্ময়ী দাসীর অবতরণ ; কিন্তু স্ত্রীলোককে যে সুখ-দুঃখ ও ভালোমন্দের সাথী করিয়া ঘরে আনিব—ইহা একেবারে অভিনব চৈতন্য। মানুষের অন্তর্চেতনায় অনেক অস্ফুট কামনাই গুপ্তভাবে অবস্থান করে শুনিয়াছি, অনুকূল অবকাশ পাইলে তাহারা প্রকাশ পায় ; আজ কাকীমা ও মণিমালা আসিয়া আমার সেই অস্পষ্ট চৈতন্যটাকে নানাভাবে খোঁচা দিয়া জাগাইয়া গেল।

চিন্তাক্ষেত্রে যখনই কোনো বিপ্লব ঘটে তখন তাহা হইতে

মুক্তি পাইবার জন্য আমি অসংযত জীবন যাপন করিয়া থাকি। মৃন্ময়ীর সম্পর্কে নূতন চিন্তা করিতে গিয়া আমি উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিলাম এবং এই সমস্যাটা অতিক্রম করিবার জন্য, যে যাহাই বলুক, আমি তিন চারদিন ধরিয়া নেশা করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। মৃন্ময়ীর সংস্পর্শে আসিয়া কয়েকমাস অস্বাভাবিক ভদ্রজীবন যাপন করিয়াছি, বর্তমান জীবনটাকে তাহারই প্রতিবাদ স্বরূপ দাঁড় করাইতে পারিলে কিছু স্বস্তিবোধ করি, এই মনে করিয়া নিজের রাশ আল্‌গা করিয়া দিলাম এবং কলিকাতার আনাচে কানাচে, সিনেমার ষ্টুডিয়োয়, রঙ্গমঞ্চের পর্দার আড়ালে যাহারা সহজলভ্য তাহাদেরই অতিরিক্ত মূল্যে ক্রয় করিয়া পরমানন্দে কয়েকটি দিন কাটাইলাম। যে-বন্যার ভয়ে মৃন্ময়ীর সাহায্যে শক্ত বাঁধ বাঁধিয়া নিজেকে সংযত করিয়াছিলাম, সহসা এই কল্পনা-বিপ্লবের মধ্যে দাঁড়াইয়া নিজের হাতেই সেই বাঁধ কাটিয়া সকল দিক প্লাবিত করিয়া দিলাম। স্ত্রীলোকের পদতলে ভক্তহৃদয়ে দাসখৎ লিখিয়া দিতে রাজি আছি, কারণ তাহারা আমাদিগকে অমৃতের আনন্দ স্মরণ করায়; কিন্তু যাহারা কোনোদিনই কাছা দিয়া কাপড় পরে নাই, তাহাদের চক্ষুর শাসনে পুরুষের ব্যবহারিক জীবন নিয়ন্ত্রিত হইবে, পুরুষ হইয়া এত বড় দৈন্যের কথা ভাবিতে পারি না। মৃন্ময়ী রাগ করিলে ক্ষতি নাই, পৈতৃক সম্পত্তির শেষ অবশেষটুকু থাকিলে শত

মৃন্ময়ী পায়ের তলায় আসিয়া পড়িবে, তখন ভালোবাসার কূল কিনারাও পাইব না। আমি আমার উন্মত্ত ঘোড়াকে দিক্‌বিদিকে ছুটাইয়া বেড়াইতে লাগিলাম।

সেদিন অপরাহ্লের দিকে একটা নূতন শিকারের সন্ধানে বাহির হইয়া কলিকাতার দক্ষিণ দিকে চলিতেছিলাম। একখানা আধুনিক মডেলের ট্যাক্সি ভাড়া করিয়া আজ তিন দিন যাবৎ ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। পেট্রলের খরচ সম্পূর্ণ আমি দিই এবং উপরন্ত দশটাকা করিয়া গাড়ীর ড্রাইভার হাতখরচ পায়। গত বৃহস্পতিবার রাত্রে বাড়ী ফিরিবার অবস্থা আমার ছিল না, সেই কারণে ট্যাক্সিষ্ট্যাণ্ডে গাড়ীর ভিতর ঘুমাইয়া রাত কাটাইয়াছি। আমার ন্যায় বেপরোয়া-চরিত্র ট্যাক্সিওয়ালা ইহার আগে নাকি আর দেখে নাই।

দ্রুত চলিতে চলিতে গাড়ীর গতি এক সময়ে মন্থর হইল। নেশায় আমার দুই চোখ ছিল স্তিমিত। চমক লাগিয়া চোখ খুলিয়া দেখিলাম পাশেই বড় বাগানে স্বদেশী সভার এক বিরাট সাজসজ্জা; মাঝে মাঝে তাহার ভিতর হইতে গগনবিদারী 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি উঠিতেছে। পুলিশ ও জনতায় জটলা পাকাইয়া গাড়ী ঘোড়া পার হইবার উপায় রাখে নাই। চৌমাথার পথ বন্ধ হওয়ায় গাড়ী এক পাশে দাঁড়াইতে বাধ্য হইল, আমি রাগ করিয়া চেঁচাইয়া ড্রাইভারকে কি যেন বলিলাম, কিন্তু পাহারা-

ওয়ালার হাত দেখিয়া সে কিছুতেই গাড়ী বাড়াইতে সাহস করিল না। ব্যক্তিগত আনন্দ, স্বার্থ ও সম্ভোগের লালসায় যাহারা ঘুরিয়া বেড়ায়, আমি তাহাদেরই একজন, সুতরাং মহৎ আদর্শের জন্য যাহারা সর্বসাধারণের সেবায় লাগিয়া লোকজন ডাকিয়া সভাসমিতি করে তাহাদের সম্বন্ধে অপরিসীম বিরক্তি বোধ করিব ইহাতে আর সংশয় কি? গাড়ী থামিয়া রহিল এবং আমি দুই চোখ লাল করিয়া ক্রুদ্ধ পশুর ন্যায় বসিয়া বসিয়া নাসাগর্জন করিতে লাগিলাম।

মৃন্ময়ীর কথাই ভাবিতেছিলাম। একজন বিশেষ স্ত্রীলোকের কথা সকল সময়ে ভাবিব এমন বিশ্রী দুর্বলতা আমার নাই; তবু, মৃন্ময়ীর কথা স্বতন্ত্র। তাহাকে আমি এখনও আমার থাবার মধ্যে পাই নাই, ইহা প্রথম কারণ; আর দ্বিতীয় প্রধান কারণ হইল যে, সে আমাকে অদ্ভুত উপায়ে সংযত করিতে জানে। ডাকাতের লুণ্ঠন হইতে আমরা আত্মরক্ষা করি, কেবলই লুণ্ঠিত হইবার ভয় থাকে। কিন্তু তাহার কাছে নির্ভয়ে আত্মসমর্পণ করিলে আর সমস্যা থাকে না, ডাকাতের মনুষ্যত্ব-বোধ জাগে। তেমনিই করিয়া মৃন্ময়ী আমাকে ভুলাইয়াছে। জানি ইহা নারীর একটা অস্ত্র, কিন্তু এই অস্ত্রের কাছে পরাজয় মানিয়া ফেলি, লুণ্ঠন করিতে পারি না। এই দুর্বলতা কাটাইবার চেষ্টা করিয়াছি, আজিও পারিয়া উঠি নাই।

বাহিরে মহা কলরোল কোলাহল চলিতেছিল। বোধ করি সভা ভাঙিয়া যাইতেছে। ইহার পরে জনস্রোত বাগানের ভিতর হইতে বাহির হইয়া পথের উপর আসিয়া পড়িবে, আমার গাড়ী আর চলিতে পারিবে না। সুতরাং হর্ণ দিয়া চেঁচামেচি করিয়া অনেক কষ্টে পাহারাওয়ালার নিকট চলিবার অনুমতি পাইলাম। কিন্তু পাইবামাত্রই বাধা পড়িল। কে এক ছোকরা রাস্তা পার হইবার সময় সহসা গাড়ীর ভিতর আমাকে দেখিয়াই কাছে আসিয়া বলিল, ভালো আছেন? এদিকে কোথায় যাবেন?

তাহার দিকে চাহিলাম এবং বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিলাম, বিশেষ আপত্তিকর জায়গায় যাবো। কে তুমি?

চিনতে পারলেন না?

বলিলাম, একটুও না।

সে কহিল, ভুলে গেলেন? আমি যে সেই শ্যামাকান্ত, সেই নাম-ভাঁড়ানো নীরেন।

তাই নাকি। হ্যাঁ, তাই বটে। আচ্ছা, এসো গাড়ীতে, তোমাকে এগিয়ে দিতে পারবো। কতদূর যাবে?

নীরেন কহিল, যাবো না কোথাও, দিদি ওই সভায় গেছেন, তাঁর বক্তৃতা আছে—আমি তাঁরই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি।

হাসিয়া বলিলাম, তোমার এই ভক্তির বক্‌শিস কি, নীরেন।

নীরেন হার মানিল না, বলিল, দিদির আদেশ পালন করার আনন্দই আমাদের বক্‌শিস। তিনি জেনারেল, আমরা সৈন্য।

বটে? একটি তরুণী লীডারের স্নেহ-ছায়ায় তোমাদের মতন কতগুলি ভাই আছে বলো ত'?

নীরেন হাসিল, কিন্তু আর উত্তর দিল না। আমার চোখ মুখের চেহারা দেখিয়া সে কিছু সন্দেহ করিল কিনা বলিতে পারি না। কিন্তু আমি একটু অস্বস্তি বোধ করিলাম।

চলিয়া যাইতে উদ্যত হইতেই নীরেন বলিল, আপনি একটু দাঁড়ান দয়া ক'রে। দিদিকে যদি পৌঁছে দেন তবে বড় ভালো হয়, আজ তিন দিন সভাসমিতির কাজে তাঁকে অনেক হাঁটাহাঁটি করতে হয়েছে।

আমার যে অনেক কাজ হে।

পাঁচ সাত মিনিটও অপেক্ষা করতে পারবেন না? এখনই বেরোবেন তিনি।

একটু ভয় পাইলাম। মৃন্ময়ী অনুরোধ করিয়াছিল, নেশা করিলে আর যেন তাহার সহিত সম্পর্ক না রাখি; সেই অনুরোধ আমি মানি নাই। আড়ালে যাহাই হোক কিন্তু সে আসিয়া আমার এই বীভৎস মূর্তি চোখে দেখিবে ইহা বড়ই লজ্জার কথা। বলিলাম, এখন আমি যাই। তোমার দিদিকে বোলো তাঁর সঙ্গে এক সময় আমি দেখা করবো।

কোথায় দেখা করবেন ? তিনি ত' আর সেখানে থাকেন না ?

কেন ?

সেখানে একটা বিশেষ অশান্তি ঘটে গেছে।

বলিলাম, এখন তবে থাকেন কোথায় ?

কোনো ঠিক নেই। আজ কদিনই এখানে ওখানে—কাল ছিলেন আমার এক মাসিমার ওখানে। এ কদিন ওঁর ভারি কষ্ট যাচ্ছে। স্নান নেই, খাওয়া নেই···

নীরেনের গলাটা একটু কাঁপিল। আমি তাহার দিকে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলাম। যে-বেদনার প্রতিকার করিবার সুযোগ নাই, সেই বেদনার ইতিহাস শুনিলে কোথায় যেন একটু ব্যথা বাজে। আশ্রয় ও অন্নের জন্য পথে পথে সে ঘুরিয়াছে, আমাকে সংবাদ দিয়া বিব্রত করে নাই, ইহাতে আমার অভিমানেও লাগিল। কিন্তু নীরেনের অল্প এই কয়েকটি কথায় অনুভব করিলাম, ইস্পাতের অদ্ভুত কাঠিন্য আর দীপ্তি ওই তরুণীর স্বভাবে—আমার ন্যায় দুর্বলের সাধ্যও নাই তাহার সেই ঐশ্বর্যের পরিমাপ করে।

চলিয়া যাইতে পারিলাম না, ফুটপাথের ধারে গাড়ী আনিয়া নীরেনকে পুনরায় প্রশ্ন করিলাম, ভাই, তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করা হয়ত অশোভন হচ্ছে, কিন্তু বিশেষ অশান্তিটা কি, ভারি জানতে ইচ্ছে করে।

নীরেন একটু থামিল, তারপর বলিল, দিদি আপনাকে একথা কোনোদিনই বলতেন না, কারণ এখানে তাঁর আত্মসম্মানের দায়িত্ব আছে। কিন্তু আমার পক্ষে বলাই বোধ হয় কর্তব্য, কেন না দিদির দুঃখকষ্ট একেবারে মাথা ছাপিয়ে উঠেছে।

বলিলাম, যদি তোমরা ব্যথা পাও তাহ'লে ব'লো না, নীরেন।

ব্যথা আমার নয়, দিদির। আমাকে তিনি তিরস্কার করবেন জানি, কিন্তু তাঁরই মুখ চেয়ে আমি—

নীরেনের চোখে জল আসিয়া পড়িল। আমি চুপ করিয়া রহিলাম। সে গলা পরিষ্কার করিয়া বলিল, দয়া ক'রে আপনি কারো অপরাধ নেবেন না, রাজেনবাবু। আপনাকে তারা কেউ চিনতে পারেনি—

বিস্মিত হইয়া বলিলাম, কি ব্যাপার হে?

লজ্জিত নত মুখে নীরেন বলিল, দিদির কাছে আপনার যাতায়াত নিয়েই কথাটা ওঠে।

তাহার মুখের দিকে চাহিলাম, চাহিয়া প্রশ্ন করিলাম, তারপর?

তাঁদের সকলেরই একটা বিশ্রী সন্দেহ হয়—

তাই নাকি? তারপর?—আচ্ছা থাক্, বুঝতে পেরেছি, নীরেন।

এই বালকের চক্ষু হইতে সহসা নিজের মুখ কোথায় লুকাইব ভাবিতেছিলাম, এমন সময় বিদীর্ণ কণ্ঠে জনতা 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি তুলিল। নীরেন বলিল, ওই যে, তিনি আসছেন।

বিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিলাম। নীরেন গিয়া ভীড় সরাইয়া মৃন্ময়ীকে লইয়া আসিল। অত লোকজনের ভিতরে দুইজনে কি কথা হইল বুঝিলাম না। মৃন্ময়ী আসিয়া আমার গাড়ীতে উঠিয়া মুখ বাড়াইয়া বলিল, কাল এঁর বাড়ীতে গিয়ে আমার খবর নিয়ো ভাই।

আচ্ছা।—বলিয়া আমাকে একটা নমস্কার জানাইয়া নীরেন চলিয়া গেল। আমিও আমার গাড়ী চালাইতে বলিলাম।

আমার পরিমণ্ডলে একটা উগ্র মদিরার গন্ধ ছিল, বোধ করি তাহাই লক্ষ্য করিয়া মৃন্ময়ী আমাকে কোনরূপ সম্ভাষণ না করিয়া আড়ষ্ট হইয়া গাড়ীর একপাশে বসিয়া রহিল। গাড়ী দক্ষিণ দিকেই চলিতে লাগিল। আমি এক সময়ে হাসিয়া বলিলাম, দিদির জনপ্রিয়তা আজ দেখলুম স্বচক্ষে। লক্ষ লোক মিলে হাততালি দিয়ে গেল, কিন্তু হায় রে জনসাধারণ, তারা জানলো না যে, দিদি অন্ন আর আশ্রয়ের জন্য পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কোন্ দিকে যাবো বলো, মৃন্ময়ী?

মৃন্ময়ী আমার দিকে চাহিল। মদির স্তিমিত চক্ষে দেখিলাম, তাহার দুই চক্ষু ভরিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতেছে।

কাঁদিতে তাহাকে আগে দেখি নাই, অশ্রুতে তাহার চোখ মুখ ভারি সরস হইয়া উঠিল। সমবেদনা তাহার প্রতি হইতে লাগিল সন্দেহ নাই, কিন্তু একদিকে খুশিতেও আমার মন টল্‌টল্ করিতেছিল। খুব ইচ্ছা হইল—আমার সাহায্য চাহিয়া সে আরও কাঁদুক।

কিন্তু আঁচলে চোখ মুছিয়া সে কহিল, আপনার সঙ্গে যেতে পারবো না, আমাকে নামিয়ে দিন্।

বটে, আর এ-কদিন তোমাকে খুঁজে খুঁজে যে আড়াইশো টাকার পেট্রল পুড়িয়েছি? তার দাম?

আপনার এ কথার মানে কি?

থতমত খাইয়া বলিলাম, অবিশ্যি মানে কিছু নেই, তবে কি জানো, অনেকদিন তোমার সঙ্গে দেখাশোনা হয় নি।

তীব্রকণ্ঠে মৃন্ময়ী কহিল, নেশা ক'রে আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন? কী বলেছিলুম আপনাকে? আপনি উপকার করতে পারেন না অথচ স্ত্রীলোকের সম্ভ্রম নষ্ট করতে পারেন? আমাকে এখানে নামিয়ে দিন্, রাজেনবাবু।

বলিলাম, তোমার উপকার অবিশ্যি আমি করিনি, হয়ত করার সা'ধ্যও নেই। তবে তোমার সেই হাজারখানেক টাকা আমার কাছে গচ্ছিত আছে, আমার ইচ্ছে তাই দিয়ে আপাতত তোমার একটা বন্দোবস্ত—

মৃন্ময়ী বলিল, সে টাকা আমার নয়, দেশের লোকের। তাদের জন্যেই ও টাকা খরচ হবে। ও টাকায় হাত দিয়ে নিজেকে আমি অপমান করতে পারবো না।

হাসিয়া বলিলাম, টাকাটা অবিশ্যি সবই আমি খরচ করেছি। কারণ দেশবাসীর টাকার সম্বন্ধে সাধুতার পরিচয় দেবো এমন নাবালক আমি নই এবং দেশের টাকা মানেই অপব্যয়ের টাকা, এ কথা কে না জানে।

মৃন্ময়ী আমার দিকে চাহিয়া বলিল, টাকায় দরিদ্রের লোভ নেই, আছে বড়লোকের। তাদের লোভকে সংযত করবে কে বলুন? তাদের হাতে পুলিশ, তাদের হাতে সমাজ, তাদেরই হাতে দেশ শাসনের ভার। ভয় নেই, আপনার ওপর রাগ করবো না। আপনার অভ্যাস যদি হয় প্রবঞ্চনা, আমার অভ্যাস ন্যায়নীতি মেনে চলা।

বলিলাম, তুমি রাগ করছ কেন, মীনু?

রাগ? আপনার ওপর?—বলিয়া মৃন্ময়ী হাসিল, পুনরায় বলিল, আপনি কি মনে করেন নিরাশ্রয় আর নিরন্ন হয়ে আপনার সাহায্য চাইব? আমার মধ্যে দয়াবতীকে দেখেছেন, দর্পিতাকে দেখেন নি। আমাকে নষ্ট করতে পারেন, মুখ বুজে আপনার মতন ধনবান আর বলবানের অনাচার সয়ে যাবো, কারণ কিছু স্নেহের সম্পর্ক আছে বৈ কি,—করুন আমাকে

লোক-লাঞ্ছিত, জানি বলদর্পীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবার কোনো দরবারই এই দুর্ভাগা দেশে নেই। কিন্তু তবুও বলছি, আপনার ওপর রাগ আমার নেই।

তাহার দাম্ভিক উক্তি আমি আর সহ্য করিতে পারিলাম না। হাতখানা তাহার সজোরে চাপিয়া বলিলাম, কেন নেই? বলো, তোমার অহঙ্কার আমি সইবো না।

হাসিতে গিয়াও তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িল। চলন্ত গাড়ীর দোলায় তাহার ক্ষুধার্ত পরিশ্রান্ত দেহ দুলিতেছিল, তবুও সে শক্ত হইয়া বলিল, সত্যিই বলব, সৌজন্যের কোনো রীতিই আপনার জানা নেই। আপনাকে মানা করেছিলুম নেশা ক'রে আমার সঙ্গে দেখা করবেন না। আমার সম্ভ্রম নষ্ট হবে। আপনি শোনেন নি। এ কথা বার বার জানিয়ে রাখি, আপনার পায়ের তলায় আমি চূর্ণ হতে পারি, সর্বস্বান্ত হতে পারি, কিন্তু আপনার এই আচরণের সহচারিণী হতে পারিনে। গাড়ী দাঁড় করান্, আমাকে নামিয়ে দিন্ দয়া ক'রে। না না না, আমাকে ছেড়ে দিন্, পথের সমুদ্রে আমাকে তলিয়ে যেতে দিন্, এই কুৎসিত জীবন আমি সইতে পারব না।—বলিতে বলিতে সে কাঁদিয়া ফেলিল।

তাহার হাত ছাড়িয়া দিলাম। বলিলাম, আচ্ছা দেব নামিয়ে। চুপ করো, কেঁদোনা গাড়ীর মধ্যে। কোথায় যাবে তুমি?

জানিনে, আমাকে নামিয়ে দিন্।—বলিতে বলিতে সে উত্তেজিত হইয়া উঠিল।

বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছি, দক্ষিণ কলিকাতা ছাড়াইয়া দক্ষিণ দিকে অনেক দূর আসিয়াছি। তবুও গাড়ী থামাইতে বলিয়া মৃন্ময়ীকে নামাইয়া দিলাম। সত্যই সে সেই প্রায়ান্ধকার সন্ধ্যায় কূলকিনারাহীন পথে নামিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল, এবং দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সেই হতভাগিনী দেশসেবিকা ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। আমার গাড়ী আবার উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া চলিতে সুরু করিল। তখন জনহীন পথের আশপাশে কোথাও কোথাও সন্ধ্যার আলো জ্বলিয়াছে।

মৃন্ময়ী জানে না পুরুষের মন। তাহাকে ছাড়িতে গিয়াও যে আমার হৃদয় নিরুপায় আকুল হইয়া উঠিল তাহা সে দেখিতে পাইল না। সেদিন এক অদ্ভুত নেশা করিয়াছিলাম, তাহারই উগ্র মাদকতার ঝোঁকে আপন গভীর অন্তঃস্তল অবধি তলাইয়া অনুভব করিলাম, মৃন্ময়ীর জন্য সেখানে একটি শ্রদ্ধা ও সম্মানের আসন পাতিয়া রাখিয়াছি। বাহিরে তাহাকে অসম্মান করিলাম, তাহার অনুরোধের মূল্য দিলাম না, তাহার নিরাপদ আশ্রয়কে নষ্ট করিলাম—কিন্তু ভিতরে ভিতরে আমার নারীসুলভ একটি হৃদয় নিরন্তর তাহারই কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করিয়া ফিরিতেছিল। আমি যে গত কয়েকদিন হইতে তাহাকে না দেখিয়া আপন

মনেই জর্জরিত হইয়া উঠিয়াছি ইহা কি সে চোখে দেখিতে পাইল না ?

কয়েকটি মুহূর্ত মাত্র। মনে হইতে লাগিল আমার হৃদয়, আমার প্রাণ, আমার সকল ধর্মাধর্ম আর ইহকাল পরকাল ওই নিরাশ্রয় পথচারিণী ক্ষুধাতৃষ্ণা-কাতর মেয়েটির কাছে ফেলিয়া আসিয়াছি, বাকী জীবন কাটাইবার মতো কোনো সম্বল আমার নাই,—কে যেন আমার শবদেহকে বিপরীত পথে টানিয়া লইয়া যাইতেছে।

সহসা চীৎকার করিয়া উঠিলাম, এই উল্লুক, গাড়ী রোখো।

ড্রাইভার গাড়ী থামাইল। তাহাকে পুনরায় গাড়ী ঘুরাইয়া যেখানে মৃন্ময়ীকে ছাড়িয়াছি সেইখানে লইয়া যাইতে বলিলাম। সে গাড়ী ঘুরাইয়া পুনরায় দৌড়িল, আমি তাহাকে বকশিস কবুল করিলাম।

অনেকদূর আসিয়া পড়িয়াছিলাম। পথের দুই ধারে খুঁজিতে খুঁজিতে অবশেষে এক সময়ে মৃন্ময়ীকে দেখিতে পাইয়া গাড়ী থামাইলাম। গাড়ী হইতে নামিয়া তাড়াতাড়ি তিনখানা দশটাকার নোট বাহির করিয়া ড্রাইভারের হাতে দিলাম। সে গাড়ী লইয়া চলিয়া গেল।

বড় রাস্তার দুই ধারে ফাঁকা গ্রামের পথ। শীতের সন্ধ্যায়

পথে জনমানব নাই। পথের ধার দিয়া মৃন্ময়ী আপন মনে চলিতেছিল, কাছে আসিয়া ডাকিলাম, মীনু ?

সে ফিরিয়া চাহিল। আমি গিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিলাম, ফিরে এলুম তোমার জন্যে। এবার থেকে আর তোমার অবাধ্য হব না।

মৃন্ময়ী ধীরে ধীরে বলিল, সমস্ত দিন সাহস থাকে, অন্ধকার হ'লে বড় একলা মনে হয়। তখন ভয় করে।

কোথায় যাচ্ছিলে তুমি ?

কোথায় যাবো তাই ভাবছিলুম।

ধরা গলায় বলিলাম, যাবে আমার সঙ্গে ?

সে একবার আমার মুখের দিকে চাহিল, তারপর আমার হাতখানার উপর মাথা হেলাইয়া জড়িত, ভগ্ন ও অস্পষ্টস্বরে কহিল, ভয় করে।

বলিলাম, তোমার মায়ের দুর্গতি হয়েছিল আমার বাবার জন্যে, আমার হাতে তোমার দুর্গতি হ'তে দেবো না। চলো আজ আমার সঙ্গে। এ কথাটা আজ তোমার কাছে প্রমাণ করতেই হবে, আমাকে যে বিশ্বাস করে আমি তার ক্ষতি করিনে ; নিঃস্বার্থ স্নেহের কাছে আমি দাসখৎ লিখে দিতে পারি এও তোমাকে জানিয়ে দিতে হবে।

জীবনে যাহা কখনও ঘটে নাই, স্ত্রীলোকের নিকট হৃদয়াবেগ প্রকাশ করিয়া ফেলিলাম, কেবল তাহাই নয়, নারীর সহিত কথা বলিতে বলিতে এই প্রথম আমার চোখ ভরিয়া জল ছাপাইয়া উঠিল। ইহা আমার উন্নতি অথবা অবনতি বুঝিতে পারিলাম না।

৮

ধর্মতলার কাছাকাছি একটা বড় বোর্ডিংয়ে আসিয়া উঠিতে রাত্রি আটটা বাজিয়া গেল। তাহার পার্শী স্বত্বাধিকারী আমাদের দেখিয়া কোনরূপ অসুবিধাজনক প্রশ্ন করিল না, বরং সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া একটি সুসজ্জিত ঘরে আমাদের লইয়া গেল। গৃহস্থ ঘরের ন্যায় কোথাও সাজ-সরঞ্জামের ত্রুটি নাই। পাশেই বাথরুম। দৈনিক খরচ জনপিছু তিন টাকা।

উৎকণ্ঠিত হইয়া মৃন্ময়ী বলিল, এ কি করলেন?

বলিলাম, কোনো ভয় নেই, মীনু। আমি ত' রয়েছি।

আপনি থাকলে যে আরো বিপদ! ওরা বলবে কি?

হাসিয়া বলিলাম, ওরা বলবে যে শ্রীমতী মৃন্ময়ী দেবী যাদুমন্ত্র জানেন। তাঁর শাসনে বনের বাঘ ধ্যানী বুদ্ধ হয়ে উঠতে পারে। যাও, মুখ হাত ধুয়ে এসো, দু'জনে ব'সে এক সঙ্গে খাবো।

আপনার সামনে আমি খেতে পারবো না।

তাহার দিকে চাহিলাম। সে সহসা বলিল, ওরে বাবা,

আবার সেই চোখ! এই বলিয়া ছুটিয়া সে বাথরুমে গিয়া ঢুকিল। আমি খাবারের অর্ডার দিলাম।

বাহিরে মাঘের শীতের রাত্রি। কলিকাতা শহরের অবিরাম জনকোলাহল এবং যানবাহনের অশ্রান্ত জটলার ঠিক মধ্যস্থল বলিয়াই আমাদের আজিকার এই রাত্রি এত নির্জন ও নিঃসঙ্গ। নিকটে দূরে কোথাও আত্মীয়-বন্ধু, পরিচিত এমন কেহ নাই যে, আমাদের সম্বন্ধে কৌতূহল প্রকাশ করে। অতি নিশ্চিত, নিভৃত এবং নিরুদ্বেগ আমাদের এই নৈশ জীবন,—সমাজ এবং লোক-লজ্জা বলিয়া কোনো পদার্থ আমাদের চৌহদ্দির মধ্যে নাই।

মৃন্ময়ী আমিষ আহার পছন্দ করিল না, উপবাসে কাতর ছিল বলিয়া অল্প স্বল্প খাবার লইল। আমি জাতিতে হিন্দু বটে, কিন্তু আহার-বিহারে মোগল-সভ্যতার অনুগামী,—সুতরাং পার্শী স্বত্বাধিকারী মহাশয় আমাকে খাওয়াইয়া পরিতোষ লাভ করিলেন। আমি নেশা করিয়াছি তাহা তাঁহার চক্ষে ধরা পড়িল, এবং আমরা কোন্ শ্রেণীর জীব তাহাও তাঁহার ঈষৎ কটাক্ষে জানিতে পারিলাম। আমার পোষাক পরিচ্ছদ, ভঙ্গী, খোসখেয়াল দেখিয়া আমার প্রতি খাতিরের মাত্রা বাড়িয়া গেল। তিনি যাইবার সময়ে নিজের হাতে টানিয়া আমাদের ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া গেলেন। মৃন্ময়ী অপ্রস্তুত হইয়া আমার দিকে

চাহিল। আমি নত মস্তকে বসিয়া আমার হিংস্র দংষ্ট্রার সাহায্যে একটি সুসিদ্ধ মোরগশিশুর পঞ্জরাস্থি চর্বণ করিতে লাগিলাম।

মৃন্ময়ী এক সময়ে কহিল, আপনার কাছে অনেক কিছু শিখলুম।

প্রশ্ন করিলাম, যথা?

পয়সা দিলে কলকাতায় সবই পাওয়া যায়; তৈরি রান্না আর তৈরি বিছানা পর্যন্ত। এ আমি জানতুম না।

বলিলাম, এ ত' সামান্য বললে। আরো অনেক কিছু। কিন্তু মীনু, এই কথা ভেবে আমি আশ্চর্য হচ্ছি যে, তুমি যাদের প্রতিপালন করলে, তাদের কাছে তোমার ঠাঁই হোলো না? এর সত্যি কারণ কি?

মৃন্ময়ী আহার শেষ করিয়া উঠিল। হাসিমুখে বলিল, নীরেন বুঝি বলেছে আপনাকে?

না বললেও ত' একদিন এ খবর পেতুম।

তারা ছেলেমানুষ, বুঝতে পারেনি, আপনি তাদের ক্ষমা করুন।

তোমার ধর্মদাদা আর দিদিরাও কি ছেলেমানুষ?

মৃন্ময়ী বলিল, অনেকদিনের কুসংস্কার বদ্ধমূল হয়ে আছে, তাদের অপরাধ নেই। আপনার খবর তারা পেয়েছিল, তাই আপনাকে তারা পছন্দ করেনি।

বলিলাম, তুমি ত’ তাদের আপন ?

মৃন্ময়ী বলিল, দেশের কাজ তাদের সকলের আপন। আমি তাদের অস্ত্র মাত্র, আর কিছু না। জানি আমাকে ছেড়ে তারা দুঃখ পাবে, হয়ত দারিদ্র্যের দুঃখও পাবে, কিন্তু তবু আপনার সঙ্গে আমার আলাপ বরদাস্ত করবে না।

আমি ত’ তাদের কোনো ক্ষতি করিনি।

না।—মৃন্ময়ী বলিল, বরং উপকার করেছেন টাকা দিয়ে। তবু এই তাদের ধারণা। আমি কোনো বাইরের পুরুষের সাহচর্যে এসেছি, অথবা ঘনিষ্ঠতা হয়েছে, এ তারা বরদাস্ত করবে না।

একে তারা অন্যায় বলে ?

একে তারা ঘৃণা করে। তাদের জীবন, তাদের চিন্তা, কল্পনা, স্বপ্ন, তাদের ধর্মাধর্ম দেশসেবা নিয়ে। তারা ভালোবাসা বোঝে না, স্নেহ, বন্ধুত্ব, প্রেম—এ সমস্তই তাদের কাছে অলস চিত্রবিলাস। তারা মনে করেছে, আমি এদের ফাঁদে জড়িয়ে পড়েছি, তারা আমাকে উচ্ছেদ ক’রে দিয়েছে।

তুমি কি আর কোনোদিন সেখানে যাবে না ?

মৃন্ময়ী বলিল, যদি যাই, তবে তারা গোয়েন্দা মনে করবে।

বলিলাম, তাহ’লে আমি তোমার চরম ক্ষতি করেছি বলো ?

মৃন্ময়ী বলিল, ক্ষতি আমি মনে করিনি। নিজেদের ভুল

একদিন তারা বুঝতে পারবে, এই আশা ক'রে রইলুম। তারা বুঝবে পদস্খলন হওয়াটাই চরিত্র-বিচারের একমাত্র মাপকাঠি নয়, তারা বুঝবে স্খলিতপদ মানুষও আপন মনুষ্যত্বের প্রভাবে সর্ব-জনবরেণ্য দেশনেতা হ'তে পারেন,—তার প্রমাণ বাংলাদেশেও আছে। জানি আমাকে ওরা আজ তাড়িয়ে দিলে, জানি দূর থেকে চিরদিনই ওদের সেবা করব, কিন্তু ওদের একথা কোনোদিনই মানবো না যে, ভালোবাসা বা বন্ধুত্ব স্বভাবের অবনতি ঘটায়, কিম্বা—

কিম্বা কি, বলো ?

আপনার প্রতি ওরা প্রসন্ন নয়।

কিন্তু তুমি ?—প্রশ্ন করিলাম।

একটু ভয়ে ভয়ে—বলিয়া, মৃন্ময়ী হাসিয়া উঠিল।

আহার শেষ করিয়া উঠিয়া বলিলাম, মৃন্ময়ী, ব'লে রাখলুম, আমি ওদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবো।

দেখিতে দেখিতে মৃন্ময়ীর চোখ মুখ স্তব্ধ বিবর্ণ হইয়া গেল। মনে হইল আশঙ্কা আর উত্তেজনায় তাহার যেন এখনই দম বন্ধ হইয়া আসিবে। আমি খাটের উপর বসিলাম, সে সহসা আসিয়া আমার পায়ের উপর কাঁদিয়া কহিল, কী বলছেন আপনি ? আপনি কি সর্বনাশ করতে চান্ আমার ভাই-বোনদের ? জানেন, আপনার প্রতিশোধের মানে কি ?

বলিলাম, জানি, সকলের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

বন্ধ ঘরের ভিতরে এই আত্মত্যাগিনী তরুণী আমার দুই পা জড়াইয়া আকুল কণ্ঠে কহিল, আপনার বন্ধুতা আর শত্রুতা দুই-ই ভয়ঙ্কর জানি, তবু আমার সর্বস্ব নিন্, আমাকে নিয়ে যা খুশি করুন, প্রতিবাদ করবো না—কিন্তু আমার ভাইদের, আমার বোনদের আপনি বাঁচান্।

কান্নায় ও চোখের জলে তাহার সর্বশরীর ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁপিতেছিল।

বাহিরে রাত্রি এগারোটা বাজিল।

আমি তাহার হাত ধরিয়া তুলিলাম। বলিলাম, মীনু, আমাকে বোঝাতে পারো তোমার এই চরিত্রতত্ত্ব? তোমার ত' কিছু নেই, তোমার দুর্দিনে ত' কেউ সাহায্য করবে না, তবে কেন এই মিনতি? বাংলাদেশের মেয়ে কি কেবল কাঁদবে, মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াবে না? একথা কি বলতে পারো না যে, তুমি কোনো অপরাধ করোনি, আর কল্পিত অপরাধের বোঝা তোমার মাথায় যারা চাপাতে চায় তাদের বুকের রক্ত নিয়ে তুমি দুই হাত রাঙাতে পারো?

আঁচলে মৃন্ময়ী চোখ মুছিল। বলিল, না, আগে হয়ত পারতুম, কিন্তু এখন—

এখন তোমার কী পরিবর্তন ঘটেছে শুনি?

নতমস্তকে সে কহিল, জানিনে। কিন্তু মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াবার সাধ্য আর আমার নেই।

কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিলাম। পরে বলিলাম, আজকের রাতটা না হয় এখানে কাটলো, কিন্তু আবার কাল থেকে তুমি কোথায় থাকবে ?

এবারে মৃন্ময়ী মৃদু হাসিল। বলিল, কালকের কথা কালই ভাববো, আজকের রাতটা ত' ভালোয় ভালোয় কাটুক।

বলিলাম, মীনু, বসো এইখানে। আমি কি ভাবছি জানো ? ভাবছি আজকের রাত স্থধু কেন, তোমার সমস্ত জীবনের প্রত্যেক দিনরাত্রিই ভালোয় কাটুক।

হাসিমুখে মৃন্ময়ী পাশে বসিয়া কহিল, বিশ্বাস হয় না।

কি বিশ্বাস হয় না বলো ?

আপনার কথা।

কেন ?

আপনিই ত' বলেছেন, আপনার মুখের সঙ্গে মনের মিল নেই ?

গলার আওয়াজেও কি বুঝতে পারো না ?

মৃন্ময়ী বলিল, আপনি সেদিন বলছিলেন, নেশা করলে মনের মধ্যে একটা কৃত্রিম আর ক্ষণস্থায়ী আবেগ তৈরী হয়,

কারণ মাদকবস্তুতে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে উত্তেজনা জমতে থাকে, সে কারণে মুখে ভেসে ওঠে প্রলাপ,—এসব ত' আপনারই কথা।

বলিলাম, তাহ'লে আমার কথায় তুমি বিশ্বাস করো না ?

বিশ্বাস করবার মতন কথা ত' আপনার নয়।

কিসে বুঝলে ?

সে কহিল, আপনি আমার কল্যাণকামনা করলেন, অথচ ভেবে দেখলেন না রাত্রি আমার ভালোয় ভালোয় কাটবে কেমন ক'রে !

বলিলাম, আমি তোমার জন্যে কি করতে পারি বলো, মীনু।

মৃন্ময়ী চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়া কহিল, ছি ছি, আমি অস্পষ্ট-ভাবে কোনো প্রস্তাব আপনার কাছে করছিনে, কোনো স্বার্থ আর হীনতা যদি প্রকাশ পায় তবে আমার মৃত্যুই ভালো, কিন্তু আমি দেখতে চাই আপনার কল্পনা।

তাহার হাতখানা শক্ত করিয়া ধরিলাম, বলিলাম, বলো মৃন্ময়ী, আমার কাছে তুমি কি চাও ?

সে কহিল, কিচ্ছু না।

যে যা চেয়েছে আমি দিয়েছি। তোমার কিছু নেই, তাই কি তুমি কিছু চাও না ?

কম্পিত কণ্ঠে মৃন্ময়ী বলিল, সহজে যদি কিছু পাই নেবো, চেয়ে নেবো না।

বলিলাম, কী পেলে তুমি খুশি হও?

আমি পেলে খুশি হই এমন কিছু আপনার আছে কিনা, তা' ভেবে দেখেছেন?

তাহার হাত ছাড়িয়া দিলাম। বলিলাম, আমার কি আছে আর কি নেই জানিনে, কিন্তু যদি তোমায় কিছু দেবার মতন যোগ্যতা আমার থাকতো, আমি সত্যিই খুশি হতুম, মৃন্ময়ী।

মৃন্ময়ী কহিল, আমি কিছু পাবার জন্যে উৎসুক—একথা কি কোনোদিন প্রকাশ করেছি? আপনার যাওয়া-আসার পথ আমি খুলে রেখেছি, দাবি কিছু জানাইনি। কিন্তু তবু নিজেকে আমি ঘৃণা করি।

ঘৃণা! কেন?

নিজের অক্ষমতার জন্যে। দুটো কাজ আমি পারিনি, আপনাকে ত্যাগ করতে আর আপনার নেশার অভ্যাস ছাড়াতে।

নেশার চেয়েও ত' মন্দ অভ্যাস আমার আছে।

মৃন্ময়ী আমার মুখের দিকে চাহিল, বলিল, জানি। এও জানি, আপনি যা কিছু মন্দ কাজ করেন তার সঙ্গে আপনার হৃদয়ের যোগ নেই। জানি, কিছুতেই আপনি তলিয়ে যাবেন না।

বলিলাম, কি ক'রে জানলে?

মৃন্ময়ী হাসিয়া কহিল, মেয়েমানুষের চোখ!

কিন্তু এতই যদি জানো, এটাও জানতে পারোনি কেন যে, কি আমি চাই?

আপনার সমস্ত চাওয়াই অস্পষ্ট, তার কারণ আপনার নিজের সম্বন্ধে কিছু জানা নেই।

মানে?

মৃন্ময়ী আমার মুখের দিকে চাহিল। কহিল, আচ্ছা, আজ আমি ছাড়া এখানে আর কেউ নেই; এই রাত্রিকাল, নিজের মনের সব গেরো খুলে দিন, কল্পনাকে দিন ভাসিয়ে, তারপর আমার দিকে চেয়ে বলুন, কী আপনি চান।

তাহার প্রতি চাহিলাম। ঘরের ভিতর দপ্ দপ্ করিয়া আলো জ্বলিতেছিল, ভিতরটা যেন সকল দিক হইতেই হাসিতেছে। রাত্রি গভীর সন্দেহ নাই, বাহিরে জন-কল্লোল আর কানে আসিতেছে না, চারিদিকের পরিমণ্ডল কেমন যেন নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে। মনের গ্রন্থি কখনও খুলি নাই, কারণ মন অতি জটিল। কখনও কোনো প্রার্থনা করি নাই, ঈশ্বরের দিকে ভুলিয়াও চাহি নাই; মানুষের দরবারে কোনো আবেদন আছে, ইহাও আমার কল্পনাতীত—এবং এমনি করিয়াই চিরদিন কাটিয়াছে, এমনি করিয়াই প্রবৃত্তির তাড়নায় অন্ধের ন্যায় আজীবন ছুটিয়াছি, পিছন দিকে লক্ষ্য করি নাই। কি চাহি

তাহা জানি না, কি পাইব তাহাও আমার নিকট অজ্ঞাত। মৃন্ময়ীর প্রশ্নের উত্তর আমি দিতে পারিলাম না। কেবল আড় হইয়া শুইয়া পড়িলাম।

সে উঠিয়া গেল, অন্য খাটে গিয়া বসিল। তারপর কহিল, কই, বলতে বুঝি সাহস হোলো না আপনার ?

বলিলাম, ক্ষমা করো, বলতে কিছু পারলুম না।

সে হাসিমুখে বলিল, এই কথাই আমি ভাবছিলুম। জানি, চাইবার সাহস আপনার নেই। এমন মানুষ থাকে যারা চিরকাল গোঁজ-গোঁজ করে, অহেতুক অসন্তোষে তারা পুড়ে পুড়ে খাক্ হয়, আপনিও তাই। আচ্ছা, বলতে কিছু হবে না, বুঝে নিতে পারবো। কিন্তু কই, আমার কথা ত' কিছু বললেন না ?

বলিলাম, এতকাল নিজের কথাই ভেবেছি, অন্যের ভালো-মন্দ নিয়ে কখনই আলোচনা করিনি।

মৃন্ময়ী বলিল, যে-মানুষ আপনার জন্যে ভাবে তার হিতাহিত ভাবাও কি আপনি কর্তব্য মনে করেন না ?

অর্থাৎ তুমি, কিন্তু তুমি ত' আমার কোনো সাহায্যই চাও না ?

সাহায্য ত' চাইনি, শুধু বলছি আমার হিতাহিত আপনার হাতে।

বলিলাম, তার মানে ?

মৃন্ময়ী বলিল, তার মানে আপনি যদি আজ থেকে পুরোদস্তুর একটি 'গুড্ বয়' হয়ে ওঠেন, তাহ'লেই আমি উপকৃত হবো।

গুড্ বয় তুমি কা'কে বলো ?

যে নেশা করে না, উড়নচুড়ে নয়, যে বাধ্যবাধকতা মানে, বেহিসেবী নয়, যার কর্তব্যবোধ আর দয়াধর্ম আছে।

এইবার আমি হাসিলাম। বলিলাম, আগের কথাগুলো বুঝতে পারি, কিন্তু শেষের দিকে ওই যে কর্তব্যবোধ আর দয়াধর্ম —ওর মানে কি ?

জানি নে।—বলিয়া মৃন্ময়ী সহসা লেপ মুড়ি দিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিলাম। তারপর উঠিয়া বসিয়া বলিলাম, নেশা আমার ছুটে গেছে, এখন আমার কথা বিশ্বাস করতে পারো। আজ যদি বলি তোমাকে আমি ভালোবাসি, তাহ'লে নিজের কানেই কথাটা হাস্যকর শোনায়, সুতরাং সে-কথা বলব না। এমন কথাটা যদি বলি তোমাকে ছেড়ে থাকা আমার পক্ষে কঠিন, তাহ'লেও তুমি বিদ্রূপ করতে পারো, কারণ পথে-পথেই তুমি বাসা বেঁধেছ—তুমি আমার থেকে কিছুই নিতে চাও না। তবু আজ এই রাত্রিকালে আমার বুকের ভিতরকার ঈশ্বরের দিকে চেয়ে বলছি, আমার কাছে কিছুই যে চায় না সে আমার বড় প্রিয় ; ইচ্ছে করে তারই জন্যে আমি সর্বস্বান্ত হই।

আচ্ছা মৃন্ময়ী, আমাকে ত্যাগ করতে পারোনি ব'লে নিজেকে তুমি ঘৃণা করো ?

লেপের ভিতর হইতে মৃন্ময়ী বলিল, হ্যাঁ।

কেন ? আমি কি এতই অমানুষ ?

মুখের উপর হইতে লেপ সরাইয়া মৃন্ময়ী কহিল, সম্পূর্ণ অমানুষ হ'লে ছেড়ে যাওয়া সহজ হোতো। কিন্তু তা আমি পারিনি। আপনার জীবনের দিকে চাইলে আমার কান্না পায়, অনেক ভালো জিনিস আপনার মধ্যে চাপা রইল, অনেক বড় আদর্শের কথা আপনার মধ্যে তলিয়ে গেল ; দেখলুম, আর ভাবলুম আপনার সম্ভাবনা ছিল অনেক। বুদ্ধি আর বিক্রম দিয়ে জীবনটাকে আপনি শাসন করতে গেলেন, সেইজন্যে দানবীয় রূপটাই দেখা গেল ; যদি এর সঙ্গে থাকতো জ্ঞানের যোগ, তবে আপনার আর ভাবনা কি ছিল ? সম্ভোগের আনন্দে নাচলেন এতকাল, কিন্তু চেয়ে দেখেননি আপনার পায়ের চাপে কত প্রাণ গুঁড়িয়ে গেল। আপনাকে ত্যাগ করতে পারিনি, সেইজন্যে নিজের ওপর ঘৃণা এসে গেছে। আজ দেখছি নিজের প্রাণের কাঙালপনা, দেখছি নিজের নিরুপায় আত্মসমর্পণ। যত কঠিন ছিলুম, ততই নরম হয়ে পড়েছি। একটা ভয়ানক মন্ত্রে আমার শরীরে, মনে, চিন্তায়—সমস্ত কিছুতে ভাঙন ধরেছে, একে রোধ করবার সাধ্য আর আমার নেই। সচেতন মন

বলছে, এ তোমার কী অধঃপতন হোলো? কিন্তু প্রতিবাদ কানে যায় না, সজ্ঞানে তলিয়ে যেতেই ভালো লাগছে।

তাহার গলা ধরিয়া আসিতেই সে চুপ করিল, নচেৎ হয়ত আরও অনেক কথা বলিয়া যাইত। জীবনে বহু রাত্রি বহু রকমে অতিবাহিত করিয়াছি, কেমন করিয়া যেন তাহাদের কয়েকটা মনে পড়িয়া আজ মাথা হেঁট হইয়া আসিতেছে,—অপব্যয়ে, অন্যায়ে আর আত্ম-অবমাননায় সেগুলা যে শুধু ঘৃণ্য তাহা নহে, করুণও বটে—অথচ আজিকার এই অদ্ভুত রাত্রি আমার জীবনে কী বিচিত্র, কিরূপ আশ্চর্যময় ইহার প্রতিটি নিবিড় মুহূর্ত! সত্য কথা বলিতে বসিয়াছি, অবিশ্বাস্য হইলেও, সত্য বলিব। মৃন্ময়ীর সমস্ত দেহ ও মন ভরিয়া যদি বা কিছু একটা ইচ্ছা জাগিয়া থাকে, আমার দিক্ হইতে তাহার কিছুমাত্র চাঞ্চল্য নাই। তাহার সম্মান ও সম্ভ্রম-রক্ষার কেমন একটা দায়িত্ববোধ এবং তাহার সহিত নিজেরও একটা আত্মসম্মান যেন মিলিয়া-মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে—তাহারই একটা দুর্লভ সৌন্দর্য আমি যেন মনে মনে অভিভূত হইয়া দেখিতে লাগিলাম। ভাবিলাম এই মেয়েটিকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করিয়া চলিবার হয়ত প্রয়োজন আছে, সংযম ও শুচিতা রক্ষা করিবার হয়ত মূল্য আছে।

বলিলাম, মৃন্ময়ী, কোথা যাবে কাল তুমি? মৃন্ময়ী উত্তর দিল, যে দিকে হোক যেতেই হবে।

এই যে বললে তুমি আমাকে ভালোবাসো, তাহ'লে যাবে কেমন ক'রে ?

ভালোবাসলে চ'লে যাওয়া ত' আটকায় না।

কিন্তু তুমি যে ধ'রে রাখতেও চাও না, ছেড়ে দিতেও চাও—সেটা কেমনতরো ?

মৃন্ময়ী কহিল, বরং ছেড়ে দেবো, কিন্তু ধ'রে রাখতে পারব না।

পারবে না কেন ?

দস্যুকে বশীভূত ক'রে রাখবো এমন ধনরত্ন ত আমার নেই।

বলিলাম, কিন্তু তোমাকে যদি আমি ছেড়ে না দিই ?

সভয়ে মৃন্ময়ী বলিল, কী বলছেন ?

আস্কারা পাইয়া পুনরায় কহিলাম, ধরো, তোমাকে ছেড়ে যদি আমার মন না ওঠে ?

তার মানে আমাকে পরিপূর্ণ অপমানের মধ্যে টেনে নিয়ে যেতে চান্ ?

বলিলাম, তোমার মান কিসে যায় আর কিসে থাকে, আমি ত' বুঝে উঠতে পারলাম না। কিন্তু অকপটে আমি এই কথা বলতে চাই, তোমাকে ছেড়ে থাকতে গেলে আমার কষ্ট হবে।

মৃন্ময়ী কহিল, ছেড়ে ত' থাকতেই হবে।

কেন ?

ধ'রে রাখার কোনো উপায় নেই, সেই কারণে।

কেন ?

সে স্পষ্টকণ্ঠে কহিল, মানুষের চোখের আড়ালে যদি কিছু অন্যায় ঘটে ত' ঘটুক, আড়ালে-অন্ধকারে যদি এক-আধটা জীবন নষ্ট হয়ে যায় তাও সইবে, কিন্তু সকলের মাঝখানে সকলের নীতিবোধকে বিষাক্ত করব, এই স্পর্ধা আমার নেই।

বলিলাম, যদি ভদ্রজীবন যাপন করা যায় ?

মৃন্ময়ী উঠিয়া বসিল, ভদ্রজীবনের অর্থ কি ? যে-গাছের গোড়ায় বিষ তার ফল মিষ্টি হ'লেও তা'তে বিষ মেশানো। ওতে আমার মন ভুলবে না। ভদ্রজীবন ? তার ভবিষ্যৎ কি ? সস্তা বিদ্রোহ ক'রে আধুনিক তরুণ-তরুণীর মন ভোলাতে চান্ ? ভবিষ্যতের দায়িত্ব কোথায় ? সংখ্যাবৃদ্ধি হ'লে কোন্ সমাজে তাদের আশ্রয় মিলবে ?

মূর্খ হ'লেও আমার মুখ দিয়া একটা কথা বাহির হইল, নতুন সমাজ।

মৃন্ময়ী হাসিয়া কহিল, নতুন সমাজ মার্কিন দেশেও ছিল, আর তাদের সমাজের চেয়ে আধুনিক পৃথিবীর আর কোথাও নেই শুনেছি। কিন্তু হঠাৎ একদিন এক বাংলা কাগজে পড়লুম যে, ম্যাক্সিম গোর্কীকে তারা সহ্য করেনি, তাঁর স্ত্রীকে ধর্মপত্নী ব'লে তারা মানে নি। অত বড় জীবন-তপস্বী এত বড় অপমান

সয়ে গেল ওই আপনার নতুন সমাজের কাছে। থামুন, বুলি আওড়াবেন না মেয়েমানুষের কাছে, মেয়ে হ'লে বুঝতেন ভয়টা কোথায়।

আমি উঠিয়া গিয়া তাহার খাটের একপাশে বসিলাম। তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলাম, যদি বলি তোমাকে সম্পূর্ণ নির্ভয় ক'রে তুলতে পারব ?

মৃন্ময়ী কহিল, আপনাকে বিশ্বাস করবার মতন ত' কোন কাজ আপনি করেন নি ?

বলিলাম, মীনু, অনেক আঘাত করেছ, অনেক খোঁচা দিয়েছ, আমাকে সত্যিই তুমি চিনেছ, সন্দেহ নেই। কিন্তু তবু বলছি—তোমার ভালো থাকা মন্দ থাকার ওপর আমার জীবন মরণ নির্ভর করছে। আমি নিজে কিছু করতে জানিনে ; এমন মানুষকেই আমার দরকার, যে আমাকে দিয়ে সব কাজ করিয়ে নিতে পারবে।

সে কহিল, আমি ত' সে মানুষ নয়, জোর ক'রে আপনাকে দিয়ে ত' কিছু করিয়ে নিতে পারব না।

বলিলাম, তুমিই সেই মানুষ। তুমি সব পারো। অতগুলি ছেলেমেয়ের দায়িত্ব তোমার হাতে ছিল, নিজের মান-সম্ভ্রম বিপন্ন ক'রেও ওদের তুমি চালনা করেছ। এ কাজ মহৎ, এর তুলনা নেই মীনু, আমি নিজেও পিছিয়ে পড়তে চাইনে অথচ

আমাকে এগিয়ে যেতেও তুমি দেবে না। তাহ'লে আমি কোথায় দাঁড়াই বলো ত ?

মৃন্ময়ী কহিল, আপনি এত বড় সম্পত্তির মালিক, অত নগদ টাকা, আত্মীয় পরিজনের মাঝখানে আপনি মানুষ, আপনার সামাজিক প্রতিষ্ঠা—আপনার মাথার ওপর আজো মা বেঁচে,—আমাকে আপনি এই প্রশ্ন করেন কেন ?

আমার কণ্ঠ আবেগে কাঁপিয়া উঠিল, বলিলাম, সমস্তই আছে, সবাই রয়েছে চারিদিকে, কিন্তু আমাকে পথের সন্ধান ত' কেউ দেয়নি, মৃন্ময়ী ? আমার এতখানি লাঞ্ছনা, এত বড় ত্যাগ ত' কেউ স্বীকার করেনি ? এমন যদি মনে করো আমার সব দোষ-ত্রুটি শুধরে আমাকে মানুষ ক'রে তোলাই তোমার কাজ, তাহ'লে আমাকে তোমার সব কাজের ভার দাও।

মৃন্ময়ী কহিল, আমার জন্যে আপনি এত দাম দিতে চান কেন ?

অনেক কারণে। পিতৃঋণ আমি শোধ করতে চাই,—আমি জানি তোমার মা আমাদের অন্যায়কে ক্ষমা করতে গিয়ে নিঃশব্দে মৃত্যু বরণ করেছেন। আমার বাবাকে অপরাধী বলতে পারব না, কিন্তু অবশ্যম্ভাবী কলঙ্কের দিকে তোমার মাকে তিনি যে ঠেলে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন, আমি তারই একটা প্রতিকার করতে চাই, আমাকে তুমি তারই সুযোগ দাও।

মৃন্ময়ীর চোখ দিয়া অশ্রু গড়াইয়া আসিল। আমি পুনরায় কহিলাম, জানি মায়ের লাঞ্ছনার সেই জ্বালা তোমার বুকের মধ্যে অহোরাত্র জ্বলছে, এও জানি পৃথিবীর সব পুরুষের প্রতি তোমার ভয়ানক অভিমান তোমার জীবনকে জর্জরিত ক'রে তুলেছে, কিন্তু তবু এই রাত্রে আমাকে বিশ্বাস করো—আমি কেবল পিতৃঋণই শোধ করিতে চাইনে, আমি কেবল তথাকথিত ভালোবাসা জানিয়েই মুগ্ধের মতন তোমার দরজায় পড়ে থাকতে চাইনে,—আমি তোমাকে দেশের জনতার মাঝখান থেকে সকল কলঙ্ক আর সকল লজ্জা থেকে তুলে ধরতে চাই গৌরব আর মহিমার দিকে,—আমাকে তুমি সেই ভিক্ষা দাও, মৃন্ময়ী।

মৃন্ময়ী আর পারিল না, খাট ছাড়িয়া পিছন দিক হইতে আসিয়া দুই হাতে আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। মনে হইল, তাহার বঞ্চিত বিতাড়িত জীবনের সমস্ত পুঞ্জীভূত চোখের জল অশ্রান্ত ধারায় নামিয়াছে।

শান্ত মনে অচঞ্চল চিত্তে সেই রাত্রে তাহার সহিত আমিও চোখের জল ফেলিলাম। কোনো বাধা আর সঙ্কোচ মানিলাম না, তাহার কাছে বসিয়া কাঁদিতে আজ আমারও পৌরুষে আটকাইল না।

৯

একটি রাত্রি জাগরণেই কাটিল। রাত্রির আলাপ রাত্রিতেই শেষ হইয়াছিল, বুঝিতে পারি নাই ভোরের দিকে তন্দ্রায় চক্ষু জড়াইয়াছে। শেষ অবধি মৃন্ময়ী ঘুমাইল অথবা কি করিল তাহা জানি না, কেবল এক সময়ে অনুভব করিলাম—তাহার কোমল করতল আমার মাথার চুলের মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে। ইহার ভিতরে যে ঘন নরম স্বাদ ছিল, তাহাতে নিবিড় সুখস্বপ্নে আচ্ছন্ন হইবার কথা; কিন্তু ইহা আমার পক্ষে এতই অভিনব যে, আমার সমস্ত স্নায়ুতন্ত্র ও শিরা-উপশিরায় কেমন একটা ঐক্যতানের ঝঞ্ঝনা বাজিতে লাগিল। আমি সচকিত হইয়া জাগিয়া উঠিলাম। রাত্রি প্রভাত হইয়াছে।

মৃন্ময়ী কহিল, ওঠো?

এই প্রথম সে আমাকে আপন জনের ন্যায় 'তুমি' বলিয়া সম্ভাষণ করিল। আমি একটু হাসিলাম, কিন্তু আনন্দের আতিশয্যে আমার দুই চক্ষু পুনরায় সুখনিদ্রায় জড়াইয়া

আসিতে চাহিল। তাহার হাতখানা শক্ত করিয়া ধরিয়া গলার কাছে চাপিয়া রাখিলাম। আজ তাহাকে ভারি অন্তরঙ্গ বলিয়া মনে হইতে লাগিল; মনে মনে কি যেন একটা ইচ্ছা করিতেছিল।

মৃন্ময়ী বলিল, নেশার ঘুম বুঝি সহজে ভাঙতে চায় না?

বলিলাম, একে নেশার ঘুম, তায় আবার তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দেওয়া—উঠতে ইচ্ছে না-হওয়া কি এতই অপরাধ?

কিন্তু পাপিষ্ঠাকে তাড়িয়ে দেবে বলেছিলে যে?

হাসিয়া বলিলাম, তাড়াবো আর কেমন ক'রে, পাপিষ্ঠার ফাঁদে যে ধরা দিলুম—এই বলিয়া তাহাকে ধরিতে গেলাম, সে সভয়ে পিছাইয়া গেল।

স'রে গেলে যে?

হাসিমুখে মৃন্ময়ী কহিল, তোমাকে চুক্তিভঙ্গের অপরাধ করতে দেবো না।

এমন চুক্তি ত' হয়নি যে, তোমাকে আদর করতেও পাবো না?

সেটা অবশ্যই উহ্য ছিল। নাও ওঠো, সত্যি তামাসার সময় নেই। আর একটু বেলা হ'লেই আবার হোটেলওয়ালা হয়ত সারাদিনের দাম ধরবে।

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলাম, মৃন্ময়ী, বালবিধবা

কাদের বলে জানো? যারা পূর্বজন্মে তাদের ভালোবাসার পাত্রদের অসময়ে ঘুম ভাঙিয়ে তোলে।

মৃন্ময়ী অতিশয় চতুর। পুনরায় হাসিয়া সে কহিল, প্রিয়পাত্র শব্দটা কিন্তু অস্পষ্ট, ওটাকে সহজ ক'রে বলো।

বলিলাম, এই ধরো প্রণয়পাত্র, অথবা স্বামী।

তাহার উত্তর দিবার পূর্বে দরজায় আওয়াজ হইল, মৃন্ময়ী তাড়াতাড়ি গিয়া দরজা খুলিল। একজন চাকর ষোড়শ উপচারে প্রাতরাশ সাজাইয়া আনিয়াছে। এবার আমাকে উঠিতেই হইল। উঠিয়া লক্ষ্য করিলাম—মৃন্ময়ী ইহারই মধ্যে কখন স্নান সারিয়া লইয়াছে। তাহার সদ্যস্নাত চেহারায় দ্বিগুণ সজীবতা দেখিলাম।

মুখ ধুইয়া আসিয়া দুইজনে খাবারের টেবিলে বসিলাম। অতঃপর হোটেল হইতে বাহির হইয়া আমাদের কর্তব্য কি, তাহা কিছু নির্দিষ্ট ছিল না। আমি মনে মনে যে কল্পনাটি করিতেছিলাম, তাহা মৃন্ময়ীর নিকট প্রকাশ করিবার সাহস ও সুযোগ পাইতেছিলাম না। কেমন করিয়া তাহার ভূমিকা করিব, তাহাই ভাবিতেছিলাম।

মৃন্ময়ী বলিল, খেয়ে দেয়ে উঠেই বেরিয়ে পড়তে হবে, এখানে ব'সে তোমাকে কিন্তু খোশগল্প করতে দেবো না।

বলিলাম, আমি কি কেবল খোশগল্পই করি, মীনু?

সে বলিল, তুমি আর যাই করো, ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবো। পুরুষ-মানুষের যত মত্ততা কেবল বর্তমান নিয়ে।

বলিলাম, ভবিষ্যৎ আমার এতদিন ছিল না, এখন থেকে তৈরি হোলো।

কেমন তার চেহারা শুনি ?

ক্রমশঃ প্রকাশ্য একটি উপন্যাস। যতটা বেরিয়েছে ততটাই পড়া যায়, পরিণতিটা কল্পনা করা যায় বটে, তবে খুব স্পষ্ট নয়।

মৃন্ময়ী বলিল, নায়ক-নায়িকার ভাবগতিক দেখেও বুঝতে পারো না ?

বলিলাম, মৃন্ময়ী, আধুনিক মনস্তত্ত্ব-বিজ্ঞানের আওতায় তারা গ'ড়ে উঠেছে, তাদের মুখের সঙ্গে মনের মিল নেই, মনের সঙ্গে মিল নেই কাজের।

একটা আদর্শ ত' আছে।

উদ্‌ভ্রান্ত আদর্শ। এই যুগের অভিসম্পাতই এই যে, কোন আদর্শের সুস্পষ্ট সংজ্ঞা নেই। কোন একটা স্থায়ী বিশ্বাস আর জীবননীতি আজকের দিনে গ'ড়ে উঠতে পারছে না ব'লেই একদিকে তাদের যেমন আত্মবিশ্বাস নেই, অন্যদিকে তারা হয়ে উঠেছে তেমনি নীতিজ্ঞানহীন। মনটা তাই স্থিতিশীল নয়,—যাকে বলে নিত্য আন্দোলিত।

এই সব কথা কে আমার মুখ দিয়া বলিতেছিল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। মৃন্ময়ীর কথায় সচেতন হইয়া উঠিলাম। সে কহিল, সমাজতত্ত্বের কথা এখন থাক্। বকতে আরম্ভ করলে আর তুমি থামতে চাওনা। খেয়ে নাও, চল বেরিয়ে পড়ি।

প্রাতরাশ শেষ করিলাম। স্নানের সুযোগ ছিল, স্নান করিয়া প্রস্তুত হইলাম। মৃন্ময়ী কহিল, আমার না হয় মাথার ওপর কেউ নেই, কিন্তু তুমি এই যে বাইরে-বাইরে রয়েছ তোমার মা কিছু বলবেন না?

বলিলাম, তিনি জানেন।

কি জানেন?

জানেন তাঁর ছেলের চরিত্র।

ছেলের চরিত্র যে মন্দ, এ কথাও কি তিনি জানেন?

বলিলাম, না। বরং এই কথাই জানেন যে, তাঁর ছেলের চরিত্র ব'লে কোন পদার্থই নেই। স্ত্রীলোক সম্বন্ধে আমার কিছু পক্ষপাতিত্ব আছে, এ তিনি বহুকাল থেকেই লক্ষ্য ক'রে আসছেন।

মৃন্ময়ী কহিল, কিন্তু তিনি যদি আমার কথা শুনতে পান?

শুনতে পেলে ক্ষতি নেই, তবে তোমার সঙ্গে আমার হৃদ্যতা ঘটেছে, একথা শুনলে তিনি অন্নজল পরিত্যাগ করবেন।

মৃন্ময়ীর চোখ দুইটা অলক্ষ্যে শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু কয়েক

মুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া সে হাসিয়া ফেলিল। কহিল, বেয়ারিং চিঠি দিয়ে মাকে জানিয়ে দেবো যে, আপনার ছেলের সঙ্গে আর যাই হোক, হৃদ্যতা আমার একটুও ঘটেনি।

তামাসা করিয়া কহিলাম, সমস্ত রাত একত্র থেকেও নয়।

নিশ্চই।

হৃদ্যতা ঘটবার সুযোগ দেবে কি ?

না, মহাশয়।

বলিলাম, তাহ'লে ত' নায়ক-নায়িকার ভবিষ্যৎ বড়ই অন্ধকার দেখতে পাই। এর উপায় ?

মৃন্ময়ী কহিল, বেশ ত', বিয়োগান্ত উপন্যাস জম্‌বে ভালো।

কিন্তু মিলনান্ত না হ'লে জনপ্রিয় হবে না যে ?

যোগে-বিয়োগে যদি শেষ হয় ?

বলিলাম, দেখা যাক্, সেটা তাদের ক্রিয়াকলাপেই নির্দিষ্ট হবে। যাই হোক্ শোন বলি, উপন্যাসের পরিণতি যা-ই ঘটুক না কেন, পরিশিষ্ট একটা থাকতেই হবে। পথে বেরিয়ে পড়তে বলছ, কিন্তু কলকাতার পথ জনবাহুল্যের মরুভূমি। এটা রূপ-কথার দেশ নয় যে, বনের ফল খেয়ে আর নদীর জল খেয়ে অবাধ স্বাধীনতায় ঘুরে বেড়াবো। এখানে জীবনকে নির্দিষ্ট না করলে মৃত্যু।

কিন্তু মৃন্ময়ী আর ইহা লইয়া আলোচনা করিতে প্রস্তুত ছিল

না। কেবল কহিল, বেশ ত, যদি সুবিধে কিছু নাই হয়, তোমার পৈতৃক নগদ টাকা আছে, আর এই হোটেলের দরজাও খোলা রইল।

আমি খুশী হইলাম। মৃন্ময়ীর জন্য কিছু খরচ করিতে পারিলে আমি যেন কৃতার্থ হই। তাহার সেই হাজার টাকা—যাহা তাহার স্বদেশী ভাইরা ডাকাতি করিয়া আনিয়াছিল—তাহা আমার নিকট গচ্ছিত আছে ; সেই টাকা তাহাকে যথাসময়ে ফিরাইয়া দিব তাহাতে সন্দেহ নাই। এদিকে টাকা নষ্ট করিতে করিতে আমার নিজের একটা ধারণা জন্মিয়াছে যে, সদ্ব্যয় করিতে গেলে অর্থের পরিমাণ অল্পই লাগে। চরিত্র নষ্ট করিবার পক্ষে সকলের বড় অসুবিধা এই যে, ইহাতে টাকা পয়সা লাগে অজস্র। সাধারণ লোক চরিত্রহীন হইতে পারে না অনেকটা এই কারণে। আমার খুশী হইবার দ্বিতীয় হেতু, আজ প্রথম মৃন্ময়ী আমার টাকা নিজের জন্য খরচ করিতে স্বীকৃত হইল।

হোটেলওয়ালাকে ডাকিলাম। একরাত্রির আহার ও বাসস্থান এবং জলযোগ প্রাতরাশের জন্য সবশুদ্ধ প্রায় চৌদ্দ টাকা হইল। অতএব চাকরের বক্‌শিস সমেত পনেরোটি টাকা ব্যয় করিয়া আমরা পুনরায় দুর্গা বলিয়া পথের সমুদ্রে ঝাঁপ দিলাম। বেলা আটটা বাজিয়াছে। কলিকাতার লোক-কোলাহল তখনও ধর্মতলা ও চাঁদনীতে ঘন হয় নাই—

বসন্তকালের রৌদ্রের সহিত মধুর হাওয়া তখনও মুখে চোখে স্নেহের স্পর্শ বুলাইতেছে। দুইজনের দিকে চাহিয়া সম্ভবতঃ দুইজনেই যেন অনুভব করিলাম, রাজপথের ফুটপাথের প্রান্তে ওই সুরক্ষিত গাছগুলির চিক্কণ সবুজ পত্রাবলীর ন্যায় আমরাও যেন আজ একটি নূতন জীবন পাইয়াছি। এই চলমান লোক-যাত্রার নিত্যকর্মে আমরাও হয়ত কিছু-কিছু সাহায্য করিতে পারি। আজিকার সকালে আকাশ ভরিয়া মধুক্ষরা বসন্তকাল নামিয়াছে, আমরা যেন তাহারই আবেশ চোখে মুখে মাখিয়া পরস্পরকে নূতন করিয়া আবিষ্কার করিলাম। অপরিসীম তৃপ্তি লইয়া দুইজনে পূর্বদিকে চলিলাম। মৃন্ময়ী কহিল, একটু তাড়াতাড়ি এস।

বলিলাম, কতদূর যাবে ?

সে মুখ ফিরাইয়া বলিল, হেঁটে গেলে আধঘণ্টা লাগবে। কিন্তু তাড়াতাড়ি যেতে হবে।

কোথায় ?

আপাতত থাকার ব্যবস্থা করতে হবে ত ?

তাহ'লে গাড়ী ক'রে চল।

মৃন্ময়ী রাজি হইল। আমি একখানা ট্যাক্সি করিলাম। ট্যাক্সিকে সে নির্দেশ দিল। তাহাকে প্রশ্ন করিলাম না। এমনি করিয়াই সে আমাকে অনেক জায়গায় লইয়া গিয়াছে, আগে

হইতে কোন কৈফিয়ৎ সে দেয় নাই। এই শহরে তাহার বহু পরিচিত জায়গা, বহু সমাজে তাহার অবারিত আনাগোনা। ট্যাক্সি ছুটিয়া চলিল।

আধঘণ্টার হাঁটাপথ গাড়ীতে পাঁচ সাত মিনিটের বেশী লাগিল না। এণ্টালীর এক এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পল্লীর ধারে আসিয়া সে গাড়ী থামাইল, গাড়ীর মিটারে মাত্র বারো আনা উঠিয়াছে। ভাড়া চুকাইয়া আমি নামিয়া তাহার পিছনে পিছনে চলিলাম। ইট-বাঁধানো একটা সরু গলির ভিতর দিয়া সে অনেক দূর চলিল, পরে এক বাড়ীর দরজার কাছে আমাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়া সে ভিতরে প্রবেশ করিল। বাড়ীটা প্রকাণ্ড এবং ভিতরে নানা নরনারীর কণ্ঠ শুনিয়া আমার ধারণাটা ভাল হইল না। নিষ্ক্রিয় দাঁড়াইয়া থাকিতে আমার বিরক্তি বোধ হইতে লাগিল অথচ মৃন্ময়ী ডাকিতে পারে এই ভাবিয়া, বড় রাস্তার উপর গিয়া দাঁড়াইতেও মন উঠিল না।

দীর্ঘ দশমিনিট পরে আসিয়া সে আমাকে ডাকিল! পাছে কথা কহিলে বিরক্তি প্রকাশ পায়, এজন্য নিঃশব্দে তাহাকে অনুসরণ করিলাম। সে আমাকে অন্দরমহলে লইয়া গেল। এইটুকুর ভিতরেই দেখিতে পাইলাম, ভিতরে বহু নরনারীর আনাগোনা থাকিলেও কাহারও সহিত কাহারও সম্পর্ক নাই, একত্র সকলে থাকিলেও বালুকণার ন্যায় প্রত্যেকেই বিচ্ছিন্ন।

ইহাদেরই ভিতর মৃন্ময়ী কোথায় তাহার সম্পর্ক পাতাইয়া রাখিয়াছে ভাবিয়া বিস্ময়ে আমি চমৎকৃত হইলাম।

দ্বিতীয় মহলের দালানের কাছে আসিয়া একটি মহিলার দেখা পাইলাম। মৃন্ময়ী আমাদের উভয়ের পরিচয় করিয়া দিল, ইনি রাজেনবাবু—ইনি হচ্ছেন আমাদের মলিনাদি।—তারপর আমার দিকে ফিরিয়া সে পুনরায় কহিল, বোধ হয় বুঝতে পারলে না, ইনিই শ্রমিক-নেত্রী মলিনা মিত্র।

আমি সচকিত হইয়া উঠিলাম, বলিলাম, ওঃ আপনি? কাগজে দেখছিলুম আপনার নামে একটা মামলা চলছে না?

মলিনাদি হাসিমুখে কহিলেন, আজ্ঞে হ্যাঁ,—আসুন আমার ঘরে।

পাশেই বড় একটা হল্-ঘরে তিনি আমাদের লইয়া গেলেন। সুসজ্জিত হল্-ঘর। দেয়ালে পৃথিবীর বহু শ্রমিক-নেতার চিত্র ও 'শ্লোগান' বাঁধাইয়া ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছে। একপাশে সেক্রেটেরিয়েট্ টেব্‌ল, স্তূপাকার ফাইল ও অন্যান্য কাগজপত্র, মেঝের উপর নানান দেশের সংবাদপত্র। ঘরের একদিকে সুন্দর কার্পেট পাতা। মলিনাদি সেই ফরাসের উপর আমাদের বসাইয়া কহিলেন, এটা আমার পড়াশুনার ঘর, এখানে প্রাইভেট্ মিটিংও হয়।

হাসিয়া বলিলাম, পুলিসের উৎপাত নেই?

তিনি বলিলেন, উৎপাত নেই ; কিন্তু যাতায়াত আছে। এখানে গোপনীয় কিছু নেই, শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হ'লে গোপন করবার কিছু থাকে না। মীনু, ও ঘরে গিয়ে চা ক'রে আনো।

মৃন্ময়ী চলিয়া গেল।

তাঁহার মাথায় ঘোমটা দেখিয়া আমি ফস্ করিয়া প্রশ্ন করিলাম, আপনার স্বামী কি করেন ?

মলিনাদি হাসিমুখে কহিলেন, আমার এইসব কাজকর্ম তাঁর পছন্দ নয়, সেজন্য আমাদের বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটেছে। তিনি খুবই উচ্চপদস্থ ভদ্রলোক, তাঁর মস্তবড় ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান আছে, শুনেছি সম্প্রতি আবার বিবাহ করেছেন।

তাঁহার সহজ ও অনর্গল আলাপ শুনিয়া যেমনই বিস্মিত হইলাম, তেমনই যেন নূতন আলো চোখে পড়িল। কিন্তু কথা যখন এত সহসা উঠিল, আমিও চুপ করিয়া থাকিলাম না। বলিলাম, হিন্দু আইনে কি বিবাহ-বিচ্ছেদ আছে ?

মলিনাদি কহিলেন, না, এই দুর্ভাগা দেশের সেই সৌভাগ্য এখনও হয়নি। তবে তিনি দলিল তৈরি ক'রে আমার ওপর তাঁর সমস্ত দাবীদাওয়া ত্যাগ করেছেন।

বলিলাম, এজন্যে আপনার সামাজিক অসুবিধা ঘটে না ?

উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া তিনি ঘর ভরিয়া তুলিলেন, সেই হাসিতে আমার ভিতরকার সমাজনীতিসম্পন্ন ব্যক্তিটি কেমন যেন ভয়

পাইয়া গেল। আমি নতমস্তকে চুপ করিয়া গেলাম। লেখাপড়া ভালো করিয়া না শিখিলেও ইহা জানিতাম—সমাজসৃষ্টি মেয়েদের হাত দিয়া হয় নাই; পুরুষের মন যেদিন বহু মানবের কল্যাণের প্রতি সচেতন হইয়া উঠিল, সেইদিনেই সমাজ নামক বস্তুটির সূত্রপাত। যুগে যুগে সমাজের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়াছে মেয়েদের স্বার্থের দিকে চাহিয়া, উহা পুরুষের প্রয়োজনের দিক হইতে নহে। এই আবহাওয়ার মধ্যে মৃন্ময়ীকে আনিয়া আমার যেন কেমন দুশ্চিন্তা হইল; ইহার বিষাক্ত প্রভাব হইতে তাহাকে বাঁচাইয়া দূরে পলাইবার জন্য আমার সমস্ত মন যেন যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া উঠিল। যদিও চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম কিন্তু আঘাতের পর আঘাত করিবার জন্য আমার কূটবুদ্ধি কেবল সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিল।

বলিলাম, আচ্ছা, শুনেছি শ্রমিক আন্দোলনে নেমে অনেকে নিজের স্বার্থোদ্ধার করে, একি সত্য?

মলিনাদি হাসিয়া বলিলেন, যাঁরা করেন, তাঁদের পক্ষে আমি কিন্তু আপনার কাছে ওকালতি করব না। হয়ত কেউ কেউ করেন, তবে তাই নিয়ে সমস্তটা বিচার করা চলে না।

শুনেছি এর মধ্যে অনেক জাল জুয়াচুরি আছে।

তিনি পুনরায় হাসিলেন। বলিলেন, কিন্তু যেখানে নেই, সেখানে আপনার সহানুভূতি আছে ত?

আমি হাসিলাম। বলিলাম, আপনাদের কাজ ত' কেবল ধর্মঘট করিয়ে বেড়ানো,—এতে নামডাক অবশ্য কিছু আছে। যাকে বলে খ্যাতিলাভ।

মৃন্ময়ী তিন পেয়ালা চা করিয়া আনিল। তারপর কহিল, মলিনাদির সঙ্গে ঝগড়া করবার জন্যে তোমাকে কিন্তু এখানে আনিনি। খ্যাতিলাভ নিশ্চয়ই আছে এবং তার সঙ্গে টাকাও পাওয়া যায়। তুমি কি বলতে চাও তাই বল।

এমন সময় টেলিফোন্ বাজিয়া উঠিল। মলিনাদি উঠিয়া একটা পার্টিশনের মধ্যে ঢুকিয়া টেলিফোন্ ধরিয়া কথা কহিতে সুরু করিলেন।

বলিলাম, ঝগড়া নয় মীনু, জানতে চাইছি সব।

মৃন্ময়ী চুপি চুপি কহিল, ওঁর চেহারাটা দেখে বোধ হয় তোমার কিছু অশ্রদ্ধা জন্মেছে, কিন্তু রতনপুরের রাজার মেয়ে আর যাই হোক জোচ্চুরিতে হাত পাকাবে না। তুমি ওঁকে চিনতে পারনি।

কথাটা মিথ্যা নয়। মলিনা নামের সহিত তাঁহার রূপের সাদৃশ্য ছিল। আর যাই হোক, রাজকন্যা বলিয়া বিশ্বাস করা কঠিন। একটু অবাক হইয়া বলিলাম, অত বড়লোকের মেয়ে অথচ এই ভাবে—

মৃন্ময়ী কহিল, তুমি প্রায়ই দেখবে সাম্যবাদী আর শ্রমিক

নেতা বহু জায়গায় বেশ অবস্থাপন্ন। ধনিকের চেহারাটা কাছে থেকে সুস্পষ্টভাবে না জানলে তাদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়ানো কঠিন।

বলিলাম, স্বামীর সঙ্গে তোমার মলিনাদির বনিবনা হয়নি, তাই বোধ হয় লীডারি করতে এসেছেন, সত্যি কিনা বলো ত'?

মৃন্ময়ী বলিল, মোটেই না। ছোটবেলা থেকেই ওই। বাপের বিরুদ্ধে রাজ্যের প্রজাদলকে উত্তেজিত করেছিল, বিয়ের পরে স্বামীর ব্যবসার কর্মচারীদের নিয়ে দল পাকিয়েছিল—আজ দাঁড়াতে চায় দেশের সকল ধনাঢ্যদের কুনীতির বিরুদ্ধে। ওর স্বস্তি নেই, ওর শান্তি নেই—স্বামীর কাছে পাওয়া লক্ষ টাকা এই কাজে ওর খরচ হয়ে গেল। ওর হৃদয় অনেক বড়।

বলিলাম, বুদ্ধিটা সেই অনুপাতে ছোট। হৃদয়ের কারবার ক'রে অনেক নির্বোধ নেতা দেশের সেন্টিমেন্ট্ ভাঙিয়ে হাততালি পায়—এর প্রমাণ বাংলা দেশ। এখানে কাজের চেয়ে কথা বেশী, আন্দোলনের চেয়ে বেশী চোখরাঙানি। তোমার মলিনাদি লক্ষ টাকা খরচ করার পরেও যে তিমিরে সেই তিমিরে। টাকার চেয়ে বড় বুদ্ধি, আর হৃদয়ের অপেক্ষা বড় আন্তরিক উৎসাহ।

টেলিফোন্ ছাড়িয়া মলিনাদি আসিয়া চা খাইতে বসিলেন। বলিলেন, আপনার শেষের কথাটা আমার কানে গেছে, বোধ হয়

আপনি আমাকে শুনিয়েই বলেছেন। কিন্তু আপনি বোধ হয় বুঝতে পারেননি যে, বুদ্ধি আর আন্তরিক উৎসাহকে চালনা করে টাকা। যারা ধর্মঘট করায় আর মেটায়, তেমন এক শ্রেণীর পেশাদার নেতা আছে, সন্দেহ নেই ; তারা সব দেশে চিরদিনই থাকে—তাদের কাজ দরিদ্রদের জীবনের ছেঁড়া কাঁথায় জোড়া-তালি দেওয়া, তাদের কথা আমি ধরিনে।

আমি মারমুখী হইয়া উঠিলাম। মুখে হাসি আনিয়া বলিলাম, আপনার কাছে রাজনীতির পাঠ নিতে আমার আপত্তি নেই, যদি তার সারবত্তা থাকে।

মলিনাদি আমার দিকে মুখ তুলিলেন। তাঁহার রং কালো, চোখ দুইটা আরও ঘন কালো—কিন্তু সেই চোখে কোনো বড় প্রতিভার বিদ্যুজ্জ্বালা নেই, নিতান্তই বাঙালী মেয়ের স্নেহার্দ্র দৃষ্টি। এক পলকেই বুঝিলাম—তাঁহার ভিতরে কোথায় একটা দৃঢ় আত্মবিশ্বাস আছে, যেখানে আমার কোনো আঘাত পৌঁছিতে পারে না। তিনি বলিলেন, আপনি বোধ হয় বিশ্বাস করেন না যে, মেয়েরা নেতা হতে পারে ?

বলিলাম, মেয়ে এক জিনিস, নেতা আর এক জিনিস।

তিনি হাসিয়া উঠিলেন, অর্থাৎ নেতা তারা কোনকালেই নয়।

বলিলাম, অনেকটা বটে কারণ তারা মেয়ে।

বেশ শুনুন, আমি নেতা নই, আমি কর্মী—আর কর্মী

হওয়াই ভালো। বাংলা দেশে নেতা কারা, জানেন? যাদের বিবৃতি প'ড়ে প'ড়ে আমরা ক্লান্ত হই। অর্থাৎ কাজ নয়, কথা! তারাই নেতা—যাদের বিবৃতির সংখ্যা বেশী। আমি কর্মী, এই আমার গৌরব। আর কর্মী হিসেবে আমি যা বুঝি তাই আপনাকে জানাতে পারি। আমি বিশ্বাস করি—মজুর ক্ষেপানো আর চাষী খোঁচানো শ্রমিক আন্দোলন নয়। তারা অল্পে তুষ্ট হয়, তাদের সেই চিন্তা-দারিদ্র্য দূর করা দরকার। আমাদের দেশে আজো শ্রমিক আন্দোলন হয়নি, হয়েছে বেতন-বৃদ্ধির আন্দোলন। অর্থাৎ তারা কষ্টে আছে, তাদের কিছু স্বস্তি দাও। নেতাদের কাজ ওখানেই শেষ হলো—কিন্তু দেশের কাজ বাকি রয়ে গেল।

বলিলাম, আপনি কি চান্?

তিনি হাসিমুখে বলিলেন, এটা রাজনীতির কথা নয়, আদর্শের কথা। এ কথা সামান্য, অতি সাধারণ। শ্রমিক আন্দোলনও নয়, হরিজন আন্দোলনও নয়, জাতীয় আন্দোলন। শ্রমিকরা বেশী মাইনে পেলে খুশী, আর চাষারা বেশী ফসল পেলে খুশী। একদল চেয়ে থাকে ধনিকের প্রসন্ন মুখের দিকে আর অন্যদল চেয়ে থাকে আকাশের দিকে। এই অস্বাভাবিক অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়া দরকার।

বলিলাম, আর আমাদের অবস্থা?

মলিনাদি কহিলেন, আমরা? আমরা ত' সবাই প্রাক্তন

ধনাঢ্যদের ভগ্নাংশ। আমাদের রক্তের ভিতরে আছে সেই পুঁজিওয়ালাদের প্রবৃত্তি—সেইজন্য কেবলি চেষ্টা করি ব্যক্তিগত ভাগ্যের উন্নতি করতে। তার সাক্ষী চেয়ে দেখুন নতুন কল্‌কাতা শহরের দিকে। স্থাবর সম্পত্তি আর ব্যাঙ্কে আমানতী টাকা বাড়িয়ে তোলার কুৎসিত লালসা চতুর্দিকে। স্বাধীনতা আমরা পাব সন্দেহ নেই, কিন্তু তার পরিণতি হবে দেশের মধ্যে প্রকাণ্ড অন্তর্বিপ্লব—দিকে দিকে তারই সূচনা।

মৃন্ময়ী এতক্ষণ পরে কথা কহিল। বলিল, মলিনাদি, তুমি কি মনে কর আমরা সেদিন থাকবো? আজ যদি নিজেদের সেই ভাবী বিপ্লবের উপযুক্ত ক'রে গড়তে না পারি, তবে সেই সাগর-তরঙ্গের সঙ্গে আমরাও যাবো অগাধে তলিয়ে।

আমি মৃন্ময়ীর দিকে চাহিলাম। তাহাকে চিনিতে পারিলাম না। যাহাকে রাতে দেখিয়াছি, যাহাকে ভালবাসায় উদ্বেলিত হইতে লক্ষ্য করিয়াছি, সেই মেয়ের চোখে সহসা দেখিলাম—এক ঝলক আগুন ঠিক্‌রাইয়া পড়িল। আমি ভয় পাইলাম। ইহাদের এই বিচিত্র জীবনের সহিত আমার কখনই পরিচয় ছিল না, এক ভাবে চলিতে চলিতে সম্পূর্ণ বিপরীত জগতে আসিয়া পড়িয়াছি—আমার অতীত জীবনের যাহা কিছু ধ্যান-ধারণা, রীতি-নীতি, সমস্তই শিথিল হইয়া খসিয়া পড়িতেছিল। আমি যেন ধীরে ধীরে অদ্ভুত একটা অজানা পথে নামিয়া পড়িতেছিলাম।

মলিনাদি কহিলেন, আপনি বিশ্বাস করুন রাজেনবাবু, মৃন্ময়ীও এই কাজে ওর সমস্ত স্বার্থ বিসর্জন দিয়েছে,—ধর্মঘট আমরা করিয়ে বেড়াই নে, বিবৃতি ছড়িয়ে নেতৃত্ব করিনে—আমরা দেশের দরিদ্র আর শিক্ষাহীনদের জন্যে লেখাপড়া আর আদর্শপ্রচারের কেন্দ্রে কেন্দ্রে ঘুরে বেড়াই। ওই আমাদের সান্ত্বনা—একদিন যেন ওরা বুঝতে পারে যে, ওরা কারোই আশ্রিত নয়—বরং ওদেরই আশ্রয়ে আমরা, ওদেরই আশ্রয়ে সবাই—হোক তারা ইংরেজ, হোক কন্‌গ্রেস, হোক ভারতের তারা ক্রোড়পতি,—হোক তারা জমিদার-সম্প্রদায়। ওরা যেন বুঝতে পারে—ওদেরই সম্মিলিত কল্যাণের জন্য আমরা সবাই ওদেরই দাসত্ব করি। রাজেনবাবু, মৃন্ময়ী বোধহয় আপনাকে বোঝাতে পারেনি, কিন্তু ওরও জীবনের সর্বোচ্চ ধর্ম এই। আপনাদের মধ্যে ভালোবাসা যদি প্রকৃত আর পবিত্র হয়—তবে এই আদর্শ ছাড়া আপনাদের সামনে আর কোনো পথ খোলা নেই।—বলিতে বলিতে তাঁহার কালো মুখ কেমন একটা সৌন্দর্যে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল।

বলিলাম, আপনারা কি চান্ আমি সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে দেশের কাজ করতে নামবো।

মৃন্ময়ী কহিল, এ ত' দেশের কাজ নয়—এ কাজ তার চেয়েও বড়, এ দেশের মানুষের সেবা।

আমার কি শক্তি আছে ?

মলিনাদি কহিলেন, দধীচি মুনির কঙ্কাল নিয়ে বজ্র তৈরী হয়েছিল।

কিন্তু আমার সঞ্চয় ?

যদি কিছু থাকে ত' যথাসর্বস্ব দিন্ ; যদি না থাকে, তবে খালি দুই হাতে কাজ তুলে নিন্।

আপনারা কি মনে করেন—আমার দ্বারা কোন বড় কাজ হ'তে পারে ?

মৃন্ময়ী কহিল, তুমি ত' অনেক অসাধারণ কাজ করেছ যা বড় নয় ? এখন নিজের কাজ করতেই কি তুমি ভয় পাবে ?

চমকিয়া বলিলাম, নিজের কাজ ?

যে-কাজে সকলের ভালো হয় সেই ত নিজের কাজ,—একথা তুমি যে সেদিন বললে ?

কি বলিয়াছি তাহা মনে পড়িল না, কিন্তু এই দুইটি নারীর সম্মুখে বসিয়া আমার মন শিখার ন্যায় কাঁপিতে লাগিল। মানুষের জীবনে কোন কোন মুহূর্তে কি যে বিপ্লব ঘটিতে পারে, কেমন করিয়া যে ভূমিকম্পে সমস্ত ধূলিসাৎ হইতে পারে, তাহাই কেবল জাগ্রত চেতনা দিয়া উপলব্ধি করিলাম। আজ ভালোবাসার মূল্য দিবার সময় আসিয়াছে। সমস্ত আকাশ ভরিয়া ঝড়ের ভ্রূকুটি দেখা দিল।

১০

যে জগৎ আমার পরিচিত, সেখান হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়া কোন্ অজানা জগতে যেন ছিট্‌কাইয়া পড়িলাম। এখানকার সমাজ, চিন্তাধারা, জীবনযাত্রা ও আদর্শের অলিগলি পথ আমার চেনা নাই, সেইজন্য কোনো দিক হইতেই যেন বেশ আল্‌গা হইয়া হাত-পা ছড়াইয়া কিছুই ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিলাম না।

কিন্তু ওইটি আমার পক্ষে স্মরণীয় মুহূর্ত। যে-মৃন্ময়ীকে আমি উল্‌টাইয়া পাল্‌টাইয়া দীর্ঘ এক বৎসরকাল লক্ষ্য করিয়া আসিলাম, যাহার প্রতিটি নিঃশ্বাস, প্রতিটি রক্তবিন্দুর ইতিহাস আমি আয়ত্ত করিয়াছি, যাহাকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করিয়া একান্ত-ভাবে পরিপাক করিয়াছি, সহসা সে যেন পুনরায় বিস্ময়-রূপে দেখা দিল। মন বস্তুটি যে বিচিত্র ইহাতে সন্দেহ কি? খুঁড়িতে খুঁড়িতে অগাধে তলাইয়া ইহার আকর হইতে কত যে অদ্ভুত মণিরত্ন আহরণ করি তাহার ইয়ত্তা নাই। মৃন্ময়ী একদিন আমাকে বলিয়াছিল, তুমি ছোট নও, তুমি অনেক বড়। ইতর

জীবনযাত্রায় তোমার মৃত্যু ঘটে নাই, কারণ মানুষের ভিতরে যে আসল মানুষ তাহার গায়ে কাদা লাগে না, সে তার সমস্ত মালিন্যকে অস্বীকার ক'রে মাথা তুলে দাঁড়ায়। প্রাণের যে দেবতা তাঁর হোমাগ্নি অনির্বাণ উজ্জ্বল, সেই আগুনে বারে বারে আমাদের সকল অন্যায় পুড়ে ছারখার হচ্ছে। মৃন্ময়ী সেদিন সত্য বলিয়াছিল কিনা জানি না, কিন্তু তাহার সেই বাণী শুনিয়া আমার মাৎসর্যময় অর্বাচীন মন রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল। নিজের প্রতি কেমন যেন শ্রদ্ধা বাড়িল। আজ আমার ভিতরে যে ঝড় উঠিয়াছে তাহাতে যেন অনেক অপরিচিত উড়ো চিন্তার টুকরা দেখিতে পাইলাম। একথা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইব না যে, স্ত্রীলোকের নিকট আমি অনেক শিক্ষা পাইয়াছি। তাহারা আমাকে পাপ করিতে শিখাইল, বিদ্বেষ, হিংসা ও কলঙ্ক কাহাকে বলে জানাইল, নীচে টানিয়া নামাইল, ঘৃণা, ভয় ও অসম্মানের পথ দেখাইয়া দিল,—আজ আবার তাহারাই সন্ধান দিতেছে, সেই পথের, যে-পথ মহিমা ও অমরত্বের দিকে গিয়াছে; ভালোবাসার অপেক্ষাও যাহা বড়, সেই বৃহতের কল্যাণ-পথের সন্ধান দিতেছে।

মলিনাদির পাশে বসিয়া মৃন্ময়ীর মুখে যাহা শুনিলাম, সেটি যেন অগ্নিমন্ত্র; অমন করিয়া কোনো কথাই আগে আমি শুনি নাই। কয়েকটি শব্দবিন্যাসের ভিতরে কেবল যে অগ্নিই ছিল

তাহাই নয়—অপরিমেয় শক্তি, যাহা বজ্রের কাঠিন্য দিয়া প্রস্তুত, —সেই শক্তিও ছিল। ওইটি আমার স্মরণীয় মুহূর্ত। ওই মুহূর্তে যে বিদ্যুজ্জ্বালা জ্বলিয়া গেল, সেই প্রলয়ের আলোয় কেবল যে মৃন্ময়ীর মুখের চেহারায় অগ্নিরূপিণী নারীকে দেখিলাম তাহাই নয়, সেই আলোয় নিজেকেও প্রকাশিত হইতে দেখিলাম। চোখের সম্মুখে দেখিলাম, ভালোবাসার সহিত দেশের সেবাকে মিলাইয়া সে দেখিবে ইহাই তাহার সাধনা। প্রেমকে সে ছোট করিয়া সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিবে না ; দেশের দুর্গমের দিকে, রাজনৈতিক লাঞ্ছনা ও দুঃসাহসিক দেশসেবার পথে প্রেমকে সে প্রসারিত করিয়া দিবে। নইলে ভালোবাসা তাহার মিথ্যা, জীবন তাহার তুচ্ছ।

একটি সম্পূর্ণ বৎসর মৃন্ময়ীকে লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইলাম। শৈশবকালে তাহাকে ভালোবাসিতাম ক্রীড়নকের মতো। যেদিন হইতে তাহাকে দেখিলাম না, সেইদিন অবধি নূতন খেলা পাইয়া মাতিয়া উঠিলাম, তাহার জন্য কোনো উদ্বেগই অনুভব করি নাই। প্রকাণ্ড এই সংসারে কোথায় সে হারাইয়া গেল। আজিও সে অনাদৃত। মাতৃকুলের কলঙ্ক বহন করিয়া পথে পথে সে ঘুরিয়া বেড়ায়। জাত্যভিমানের সংস্কার সে রাখে নাই, সকল জাতির কাছেই পাত পাতিয়া সে খাইয়া বেড়ায়। সামাজিক পরিচয় তাহার নাই, বড় একটা গাছের ছায়ায় থাকিয়া

অহঙ্কার প্রকাশ করিবার মতোও কিছু তাহার নাই ; তাহার ঐশ্বর্য নাই, অর্থ নাই—তাহার জন্য কাঁদিবার অথবা ভাবিবার মানুষও আজ অবধি দেখিলাম না। পথে পথেই তাহার বাসা ; পথে পথেই তাহার নিত্য যাওয়া আসা। তাহার সম্বলের মধ্যে ছোট একটা সুটকেস, দু'চারটি শাড়ী অথবা জামা, হয়ত গোটা দুই টাকা, হয়ত বা একখানা মাথার চিরুণী—কিন্তু এই তাহার অনেক, ইহার বেশি থাকা সে প্রয়োজন মনে করে নাই, ইহার অতিরিক্ত কিছু রাখা সে দৈন্য মনে করিয়াছে। আজ যদি বা আমাকে কেন্দ্র করিয়া তাহার অবস্থান্তর ঘটিবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে, সে তাহার বজ্রকঠিন স্বাতন্ত্র্যকে প্রকাশ করিয়া ফেলিল। স্বচ্ছন্দ সংসার, সচ্ছল জীবন, নিরুদ্বেগ প্রত্যহের সুখযাপন, নিশ্চিন্ত দিবারাত্রির নিভৃত বিলাস ও সম্ভোগ—ইহা তাহার গতিশীল জীবনের পক্ষে প্রকাণ্ড একটা অবরোধ,—এগুলির মধ্যে সে বন্দীযন্ত্রণা অনুভব করিবে। তাহার কল্পনা ও কামনা অনেক বড়, অনেক বড় কাজ তাহার বাকি,—এই দৈব ক্ষুধা মিটিবার পূর্বে তাহার শান্তি নাই, তৃপ্তি নাই, নিদ্রা নাই, বিশ্রাম নাই। দেশের কাজ লক্ষ্মীছাড়ার কাজ, কিন্তু তাহাতেই মৃন্ময়ীর আনন্দ। জন্তুর মতো আত্মগোপন করিয়া থাকা, নিত্য লাঞ্ছনার শঙ্কায় শঙ্কিত মন, দারুণ অভাবের মধ্যে নিজেরই অশ্রু অঞ্জলি ভরিয়া পান করা, সুখস্বাচ্ছন্দ্য-পরিহার-করা বৈরাগী জীবন, স্থান হইতে

স্থানান্তরে বিতাড়িত হইয়া আনন্দ পাওয়া,—এই সকল ব্যাপারেই তাহার মন উল্লসিত হইয়া উঠে। কেহ কোথাও একটা স্বপ্ন লইয়া মাতিয়াছে, কেহ ঘর ভাঙিয়া দুরন্ত খেলা খেলিতেছে, কেহ সর্বস্ব ফেলিয়া দুর্গম মেরুপথের মৃত্যুর দিকে ধাবিত হইয়াছে, কেহ কোনো একটা কাল্পনিক আদর্শের জন্য পড়িয়া পড়িয়া মার খাইতেছে—ইহাতে মৃন্ময়ীর বুকের রক্ত তরঙ্গে তরঙ্গে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে। আমার সংস্কারবদ্ধ মন এক এক সময় তাহার মনের চেহারা দেখিয়া ভয় পায়—যেমন অন্ধকারে উত্তাল-তরঙ্গ সমুদ্র দেখিলে অন্তর ধক্ ধক্ করিতে থাকে। বুদ্ধির সীমানার মধ্যে, যুক্তির শাসনের মধ্যে আমি তাহাকে আঁটিয়া উঠিতে পারি না। যে সমস্যা ও প্রশ্ন লইয়া পৃথিবীর সকলে বৈষয়িক সাফল্যের দিকে ছুটিতেছে, মৃন্ময়ীর একটি ছোট হাসিতে তাহা যেন ধূলিসাৎ হইয়া যায়।

চৈত্রের দুপুরে একদিন আমি তাহাকে লইয়া বাহির হইলাম। মলিনাদির কাছে সে অধুনা বাসা বাঁধিয়াছে, সুতরাং আপাতত আশ্রয়ের সমস্যা তাহার নাই। কয়েকদিন একটু যত্ন পাইয়া তাহার স্বাস্থ্যের চিক্কণ ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহার সুন্দর দেহের কঠিন নিটোল গঠন আমার মনে পথ চলিবার উৎসাহ আনিতেছিল। রৌদ্র খরতর, পথ জনবিরল, যানবাহনের গতি

মন্থর,—আমাদের দিকে ফিরিয়া তাকাইবার অথবা ঔৎসুক্য বোধ করিবার মতো জনতা পথে কোথাও ছিল না।

প্রণয় ও বন্ধুত্বকে প্রগাঢ় করিয়া তুলিবার যে অবকাশের প্রয়োজন, সে-প্রয়োজন আমাদের আর ছিল না। ভালোবাসা লইয়া যে চৌর্যবৃত্তি, যে হাস্যকর লুকোচুরি, যে সঙ্গোপন ইতরবৃত্তি—তাহা হইতে মন সরিয়া গিয়াছে, তাহার অলীকতা প্রত্যক্ষ করিয়াছি ; নিজেকে অপরাধী মনে করিয়া লোকচক্ষু এড়াইয়া চলিবার রুচি আর নাই, এখন জীবনের উত্থান-পতনের সমস্যা নিষ্পত্তি করিবার সময় আসিয়াছে। রসায়ন শাস্ত্রের কথা শুনিয়াছি। এক পদার্থের সহিত আর এক পদার্থ মিশ্রিত করিলে তৃতীয় রসের উৎপন্ন হয়। কেমন যেন একটা জারক রসে ফেলিয়া আমাকে একদিকে যেমন কলঙ্ক-মুক্ত করা হইতেছে, অন্যদিকে তেমনই একটা নূতন ধাতু গড়িয়া উঠিতেছিল। নিজের ক্রমোপরিণতি দেখিয়া আমি নিজেই বিস্ময়মুগ্ধ হইতে-ছিলাম।

চলিতে চলিতে বলিলাম, মীনু, এমন একটা পথে এগিয়ে যাচ্ছি যেখানকার রাস্তাঘাট আমার কিছু জানা নেই।

মৃন্ময়ী বলিল, যদি ভয় করে ফিরে যাও। যেদিন জানবে কোনো বাধা আর ভয় তোমার মধ্যে নেই, সেদিন আবার কাজের ভার তুলে নিয়ো।

কিন্তু ফিরে যাবার ত' আর উপায় নেই। ফিরে যাবো কোথায় ? সেই জীবনে ? তার চেহারা ত' দেখে নেওয়া গেছে। অসচ্চরিত্রে আনন্দ আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু ক্ষতি অনেক বেশি। ফিরে যেতে আর আমাকে ব'লো না, মৃন্ময়ী। ফিরে গেলেই আমি তলিয়ে যাবো। এতদিন পরে নিজের মধ্যে যে-শক্তির সন্ধান পেয়েছি, সে যদি আমাকে ওপর দিকে না তুলতে পারে তবে তার প্রচণ্ড আকর্ষণে আমি অগাধ নিচে তলিয়ে যাবো।

আমি অসহায় বোধ করিতেছিলাম তাহা মৃন্ময়ী বেশ বুঝিতে পারিল। হাত ধরিয়া কহিল, নিজের ওপর সন্দেহ তোমার আজো ঘোচেনি। জগতের নীতিশাস্ত্রের বিচারে যা মন্দ তা তুমি অনেক করেছ, কিন্তু তাতে আনন্দ যে পাওনি তার প্রমাণ তোমার এই সন্দেহের দোলা, তুমি সুখী নও, তুমি শান্ত নও! তোমার মুখে চোখে অপরাধীর অস্বস্তির ছায়া, তাই যতদিন তোমার জীবন ততদিন এই ভূতের উপদ্রব থাকবে তোমার মনে।

বলিলাম, কিন্তু দেশোদ্ধারের পথও ত' অনির্দিষ্ট।

দেশোদ্ধারের পথ ত' বলিনি, বলেছি মানুষের পথ।

মানুষের পথ কাকে বলছ ?

চৈত্রের বাতাসে ঝরাপাতা উড়িয়া চলিতেছিল। গাছের ছায়ায় ছায়ায় মাঠের প্রান্ত দিয়া চলিয়াছি, কপাল বাহিয়া

আমাদের ঘামের ফোঁটা নামিয়া আসিয়াছে। খরসূর্যরশ্মির দিকে একবার মুখ তুলিয়া মৃন্ময়ী কহিল, মানুষের পথ তাই যাতে মনুষ্যত্ব প্রকাশ পায়। এই ধরো মানুষের নিঃস্বার্থ সেবা।

বলিলাম, মৃন্ময়ী, কথাটা শুনতে ভালো, মানুষের সেবা। সেবার কোনো স্পষ্ট সংজ্ঞা বললে না। তুমি জানো ব্যক্তি-বিশেষের সেবা সহজ, সমষ্টির সেবা সাধারণ নয়।

মৃন্ময়ী আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, যারা দলিত, বঞ্চিত, ক্ষুধিত—সেই সব মানুষের দলকে কি তুমি খুঁজে পাওনা?

বলিলাম, না, চোখে তাদের কখনো দেখিনি।

যদি তাদের মাঝখানে তুমি গিয়ে দাঁড়াও, তাদের কি তুমি আপন ক'রে নিতে পারবে?

তাদের মনুষ্যত্বের অবশেষ যদি কিছু থাকে হয়ত পারতেও পারি।

আছে—মৃন্ময়ী কহিল, নিশ্চয়ই আছে। সেই পথটি জানা দরকার, যেটি সোজা গিয়ে তাদের অন্তরে ঢুকেছে। আমরা তাদের উপকার করতে যাই, সেবা করতে যাইনে; তাই তারা দূরে ঠেলে দেয়, আত্মীয় ব'লে কাছে টেনে নেয় না। চলো, আমি তোমাকে নিয়ে যাবো তাদের কাছে।

* * * *

একটি দিন মৃন্ময়ীকে না দেখিলে সেই দিনটি আমার নিকট দুঃসহ হইয়া উঠিত। আমি যেন তাহারই নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাস লইতেছিলাম, আমার কল্পনার আকাশ যেন তাহারই দুইটি দৃষ্টির মধ্যে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। রাত্রি ভরিয়া স্বপ্নের মতো সে আমার চোখের তন্দ্রায় লাগিয়া থাকে, সমস্ত দিনমান ভরিয়া তাহারই আবেশে আমি বিভোর থাকিতাম।

পারিবারিক জীবন আমার শিথিল হইয়া আসিতেছে। যে-ঘরটি আমার অতি প্রিয়, যে সুসজ্জিত ড্রয়িংরুমের জন্য আমি এত অর্থ ব্যয় করিয়া এত দেশ হইতে 'কিউরিয়ো' সংগ্রহ করিয়াছি, তাহার মূল্য যেন আর খুঁজিয়া পাই না। ভাবিলাম, কবে এই ঘর ভাঙিবে, কবে আমি মুক্তি পাইব? ভবিষ্যতের অত্যুগ্র আলোটা আমার চোখের উপর পড়িতেছিল, সেই আলোতে আমি দিশাহারা হইতেছিলাম। দূর হইতে সমুদ্রের গর্জন শুনিতেছি, সেখানে আমাকে ঝাঁপ দিয়া পড়িতে হইবে। অতীত জীবনের আমার সকল ইতিহাস মুছিয়া যাইতেছে, নূতন পাতায় নূতন করিয়া লাভ-ক্ষতি আর সুখ-দুঃখের কাহিনী লিখিতে হইবে। ভাবিলাম এখনও সময় আছে, মৃন্ময়ীকে ছাড়িয়া আমি কোনো দূরদেশে পলাইয়া যাই, প্রান্তরে পর্বতে ঘুরিয়া বেড়াইব, আর কখনো তাহার কাছে আসিব না। জানি সে আমাকে বাঁধে নাই, আমি চিরকালের জন্য মুক্তি চাহিলেও

সে আমাকে বাধা দিবে না ; কিন্তু হায়, তাহা সম্ভব নয়, কেমন একটা অচ্ছেদ্য আকর্ষণে সে আমাকে টানিয়া লইতেছে। চাহিয়া দেখিলাম ইহা যেন আমার জীবনের একটা অবশ্যম্ভাবী পরিণতি, আমার ভিতরে প্রথম হইতে কোথায় একটা ভাবপ্রবণ দুর্বল মানুষ আত্মগোপন করিয়া ছিল, আজ মৃন্ময়ীর বারম্বার খোঁচা খাইয়া সে বাহির হইয়া পড়িয়াছে। হিংসা, কাপট্য, স্বার্থপরতা, নিম্নাভিমুখীনতা, লাম্পট্য,—সমস্ত অতিক্রম করিয়া আমার সেই ভিতরের মানুষ আজ বাহিরের আলোয় আসিয়া তাহারও বাণী প্রকাশ করিতে চায়।

সেদিন একটা নূতন জগতে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলাম। কয়েকদিন হইতে কলিকাতায় ও শহরতলীতে একটা মজুর ধর্মঘট চলিতেছিল। আজ বাইশ দিন হইল তাহারা কাজে যোগ দেয় নাই। শ্রমিক-নেতাদের সহিত সরকার পক্ষ ও মালিকদের একটা ষড়যন্ত্র চলিতেছিল। কিছু কিছু সর্ত পূরণ হইলে তবে ধর্মঘট ভাঙিবে। তাহাদের বেতন-বৃদ্ধি ও জীবন-যাত্রার সুব্যবস্থা না হইলে তাহারা কিছুতেই কাজে যোগ দিবে না।

আমার সঙ্গে মোটর ছিল। মলিনাদি, মৃন্ময়ী আর দুইজন শ্রমিক-নেতাকে লইয়া আমরা মেটিয়াবুরুজের দিকে চলিলাম। ধর্মঘটের চেহারা বর্ণনা করা অথবা শ্রমিক আন্দোলনের প্রচার

কার্য করা আমার উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু সেখানে গিয়া যাহা দেখিলাম, পৃথিবীর আর কোথাও অনুরূপ দৃশ্য আছে বলিয়া বিশ্বাস করিলাম না। মৃন্ময়ীর সহিত যতবার যেখানে গিয়াছি, সেখানেই দেখিয়াছি নিরপরাধ মানবাত্মার উৎপীড়ন, দেখিয়াছি মানুষের ভিতরকার ভগবান সেখানে পঙ্কে, দুর্গন্ধে, দারিদ্র্যে, অনাহারে, নিরাশ্রয়ে, অপমানে নতমস্তক; দেখিলাম এই নির্বোধ, হিংস্র, লোভ আর লালসা-জর্জর ক্ষুধার্ত শ্রমিক-জগতের ভয়াবহ রূপ।

মলিনাদি নোংরা বস্তির ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে বলিলেন, এরাই দেশের মানুষ, রাজেনবাবু।

আলোবায়ুহীন বস্তির ভিতরকার দুর্গন্ধে আর অন্ধকারে অসংখ্য জানোয়ার যেন বাসা বাঁধিয়া আছে। মলিনাদির কথার উত্তর দিলাম না, কেবল মনে মনে প্রতিবাদ করিলাম। বলিলাম, উহারা দেশের মানুষ নহে। লোভী আর বর্বরের কুৎসিত স্বভাবের ভিতরে যে বিকার আর ধিক্কার, যে পূতিগন্ধময় মালিন্য, ইহারা তাহারই প্রতিরূপ। এই অসংখ্য শ্রমিকের দুরবস্থা দেখিয়া ইহাদের জন্য কাঁদিব অথবা ইহাদের টানিয়া যাহারা নিচের দিকে নামাইয়াছে তাহাদের জন্য চোখের জল ফেলিব? যাহারা সমাজপতি, শাসক, ধনতান্ত্রিক, সভ্যতা প্রচার লইয়া যাহারা গর্ব করে, ইহারা যেন তাহাদের সর্বাপেক্ষা

কদর্য লোভ আর লালসার সাক্ষ্য লইয়া জীবন যাপন করিতেছে। আমার নিঃশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল।

মলিনাদি একজন নেত্রী। যাহারা ধর্মঘট করিয়াছে এমন শত শত লোক তাঁহাকে দেখিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। কোনো দল জয়গান ঘোষণা করিল, কোনো দল তাহাদের অভাব অভিযোগের কথা জানাইতে আসিল। দীর্ঘকাল ধর্মঘট করিয়া তাহাদের দিন চলিতেছে না, আশপাশের মহল্লায় চুরি-ডাকাতি বাড়িয়াছে; শোভাযাত্রা করিতে বাহির হইয়া পুলিশের সহিত সংঘর্ষে অনেকেই আহত হইয়াছে, শ্রমিক-সঙ্ঘ হইতে যে সাহায্য আসিতেছে তাহাও পর্যাপ্ত নহে। দেখিতে দেখিতে দরিদ্র, ক্ষুধাতুর, উৎপীড়িত জনারণ্যে আমাদের বাহির হইবার পথ রুদ্ধ হইয়া গেল। আপাতত মলিনাদি ও তাঁহার সঙ্গী দুইজনকে উহারা বাহির হইতে দিবে না।

সেই অন্ধকার আঁস্তাকুড়ের ধারে আমি নতমস্তকে দাঁড়াইয়া ছিলাম। আমাকে কেহ কিছু প্রশ্ন করিল না, কিন্তু একবার উপরের কালো আকাশের দিকে চাহিয়া আমি প্রশ্ন করিলাম, বিপ্লব আর কতদূর? এই যুগে আমাদের জীবিতকালে কি তাহা সম্ভব হইবে? পথ যাহাদের রুদ্ধ, বাঁচিবার অধিকার যাহারা পাইতেছে না, অশ্রুজলে সিক্ত যাহাদের অন্নের গ্রাস, নূতন সমাজ ও নবতর জীবনযাত্রাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে যাহারা

বাধা পাইতেছে,—তাহাদের রক্তে আগুন ধরিবার সময় কি এখনও হয় নাই? আমরা যাহারা ভদ্র ও শিক্ষিত বলিয়া কথিত, যাহারা মধ্যবিত্ত, যাহারা পৃথিবীর অগ্রসর চিন্তা-ধারাকে স্বাধীন কর্মপ্রতিভায় প্রকাশ করিতে পারিতেছি না,—তাহারা কি চিরদিন পদানত হইয়া থাকিবে? কোথায় সেই বিপ্লব, যে-বিপ্লব এই প্রচলন ও অস্বাভাবিক অনিয়মের ভিত্তি চূর্ণ করিবে? কবে আসিবে সেদিন?

আমি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছিলাম। মৃন্ময়ী আমাকে চিনিত, সে আমার হাত ধরিয়া টানিয়া বাহিরে আনিল। মলিনাদিকে উহারা ছাড়িবে না, তিনি উহাদের মাঝখানে রহিয়া গেলেন। আমরা ভিড়ের ভিতর দিয়া পথ কাটিয়া মাঠের ধারে আসিয়া পড়িলাম। চারিদিকে আস-শ্যাওড়া ও কাঁটালতার গাছ, আশেপাশে দুর্গন্ধ,—তাহাদেরই ভিতর দিয়া একটা সঙ্কীর্ণ পথ পশ্চিম দিকে গিয়াছে। আমরা সেই পথ ধরিলাম।

মৃন্ময়ী কহিল, অত সহজে তোমার উত্তেজনা আসে, শরীর বোধ হয় ভালো নেই।

বলিলাম, এদের তোমরা সহ্য করো মৃন্ময়ী, দম আটকায় না?

সে কহিল, ওদের মাঝখানে থাকলেই ওরা আপন ক'রে নেয়।

কিন্তু আপন হওয়া যায় কি ?

মৃন্ময়ী কহিল, উচ্চশিক্ষায় মনের জটিলতা বাড়িয়ে দেয়। ওদের মন শিক্ষার পালিশে ঢাকা নয়। ওরা আমাদের মা বলে, আমাদের সম্মানের জন্য ওরা বুকের রক্ত দিতে পারে,—যদি আমাদের ওপর ওদের লোভ থাকতো, তবে ওদের দলবদ্ধ পাশব অত্যাচারে আমরা ধ্বংস হয়ে যেতুম। আধুনিক মনস্তত্ত্বের আবহাওয়ায় ওরা পৌঁছোয়নি, তাই ওদের মহত্ব আর দুর্বলতা এখনো সতেজ রয়েছে। ওরা আমাদের আপন ক'রে নেয় সহজে, ছুড়ে ফেলে দেয় অনায়াসে।

বলিলাম, ওদের ধর্মঘট করালে তোমরা, কিন্তু ওদের দায়িত্ব কি নিচ্ছ তোমরা ?

মৃন্ময়ী কহিল, না, ওদের সাহায্য করব, দায়িত্ব নেবো না। ওদের শিক্ষিত ক'রে তোলা, স্বাধিকার-বুদ্ধি জাগ্রত করা, ওদের জীবনে বড় অসন্তোষ জাগিয়ে দেওয়া, শাসন-ক্ষমতার দিকে ওদের মনকে প্রলুব্ধ করা—এই আমাদের কাজ। নিজের মূল্য ওরা যেদিন বুঝবে, নিজের দায়িত্বও সেদিন থেকে ওরা নেবে।

বলিলাম, কিন্তু গণদেবতাকে খুঁচিয়ে জাগিয়ে তোলার পরিণাম জানো ত, মৃন্ময়ী ?

জানি—বলিয়া মৃন্ময়ী হাসিল। পথের আলোয় তাহার অধরের সেই বিদ্যুজ্জ্বালা দেখিয়া আমি কিছু বিস্ময় বোধ

করিলাম ; বোধ করি সে আমার চোখের দোষ, নচেৎ সহসা তাহার চেহারায় একটা ধ্বংসাত্মিকা ভয়ভীষণার চেহারা দেখিব কেন ? তাহার কল্যাণী রূপ দেখিয়াছি, দেখিয়াছি তাহার চোখে মুখে মধুরের তন্দ্রাবেশ, শুনিয়াছি তাহার কণ্ঠে জগদ্ধাত্রীর আশীর্বাদ,—কিন্তু এই পাশবতা কখনও দেখি নাই। যেন তাহার মুখে ভাবী ভারতের সর্বনাশা বিপ্লবের চেহারা দেখিলাম। যেন রক্ততৃষাতুরা, প্রতিহিংসাময়ী করালী কালিকার মতো সে আমার দিকে চাহিল। বলিল, জানি গো জানি, মরণে ভয় পাও কেন ? গণদানবের পায়ের তলায় একদিন চূর্ণ হবো আমরা মধ্যবিত্ত, আমাদের বংশে বাতি দিতে কেউ থাকবে না। কী অদ্ভুত দেশ তুমি ভাবো দেখি ? শতকরা নব্বইজন চাষী— যারা আমাদের প্রাণধারণের খাদ্য যোগায় তাদের অন্নবস্ত্র নেই, —আর বাকি দশজনের হাতে ধনসম্পত্তি, তারা নব্বইজনকে রেখেছে পায়ের তলায়। এ কখনো সইবে ? কোনো দেশে সহ্য হয়নি।

বলিলাম, কিন্তু তা'তে আমরাও ত' ধ্বংস হয়ে যাবো।

মৃন্ময়ী বলিল, সেই আমাদের স্বপ্ন। যে-বিপ্লব একদিন ওরা আনবে সেই তরঙ্গে আমরা তলিয়ে যাবো, সেই হবে একমাত্র আনন্দের দিন। তোমাকে আমাকে সেইদিনের জন্য প্রস্তুত হ'তে হবে।

চলিতে চলিতে গঙ্গার ধারে আসিয়া পড়িলাম। চাহিয়া দেখিলাম গঙ্গার পশ্চিম প্রান্তে শুক্ল-চতুর্থীর চন্দ্র হেলিয়া পড়িয়াছে। নদীর দুই পারে দীপমালা জ্বলিতেছে। বসন্ত-বাতাস হু-হু করিয়া বহিতেছে। বলিলাম, দূরে স্টীমারের জেঠি দেখা যাচ্ছে, চলো আমরা স্টীমারে ক'রে ফিরে যাই।

নদীর চেহারা দেখিয়া মৃন্ময়ী সব কথা ভুলিয়া গেল, উৎসাহিত হইয়া কহিল, চলো, বেশ লাগবে। নৌকো করলে না কেন? ঢেউয়ের দোলা লাগতো?

কিন্তু নৌকা পাওয়া গেল না, সুতরাং টিকেট কিনিয়া স্টীমারের জন্য অপেক্ষা করিলাম। স্টীমার আসিয়া জেঠিতে লাগিলে তাহাতেই গিয়া চড়িলাম।

প্রথম শ্রেণীর যাত্রী। শ্রমিক আন্দোলন লইয়া যতই বক্তৃতা করি না কেন, বসন্ত-বাতাসে নিরিবিলি গঙ্গার বক্ষে তরুণী সমভিব্যাহারে প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণ করিবার আনন্দ ও আরাম গণতন্ত্রের জন্য ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহি। দেশের জন্য প্রাণ পরে দিলেও চলিবে, শ্রমিকদের শাসনাধিকার পাইতে ঘণ্টা দুই দেরী হইলে ক্ষতি নাই এবং অদ্যকার এমন অপরূপ সন্ধ্যাটিতে যদি দেশের স্বরাজ ও স্বাধীনতা না পাই, তবে বিশেষ ক্ষতি মনে করিব না। আপাতত শ্রমিক-নেত্রী শ্রীমতী মৃন্ময়ীকে এতই সুন্দর দেখাইতেছে যে, আমি একরূপ

দেশের কথা ভুলিয়া নিজের প্রাণের কথাই আরম্ভ করিয়া দিলাম।

বাতাস লাগিয়া সমস্ত প্রাণ জুড়াইয়া গেল। নদীর শোভা, আকাশের উজ্জ্বল তারকাদি ও পরস্পরের নিবিড় সাহচর্যে আমাদের আগেকার আলোচনাটা ঘুরিয়া ব্যক্তিকেন্দ্রিক হইয়া উঠিল। যেন উপলব্ধি করিলাম আমাদের দুইজনের জীবন এই মুহূর্তটিতে পৌঁছিয়া কণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছে। আমরা দুইজনে—অন্তত আমি জানিয়াছিলাম আমাদের আর বিচ্ছেদ নাই, আমরা পরস্পর চিরদিনের জন্য উভয়ের নিকট বাঁধা পড়িয়াছি। মৃন্ময়ীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, স্নায়ুতন্ত্রের উত্তেজনার পর সে বড় শ্রান্ত, অবসন্ন—গঙ্গার মধুর হাওয়ায় তাহার চোখে যেন সুখতন্দ্রার নেশা লাগিতেছে। তাহার সহিত আমার চোখাচোখি হইতেই সে মৃদু হাসিয়া একান্ত নির্ভরশীলা বালিকার ন্যায় আরও কাছে সরিয়া আসিয়া আমার হাতের মধ্যে মাথা গুঁজিল।

প্রথম শ্রেণীর এই দিকে বসিলে কোথাও হইতে দেখা যায় না। স্টীমার নদীর জল কাটিয়া কাটিয়া চলিতেছিল। আজ আমার হাতখানা কিছুতেই আর সংযত হইতে চাহিল না, তাহার গলা বেড়িয়া পিঠের উপর দিয়া হাতখানা জড়াইয়া কহিলাম, এ ত' শ্রমিক-নেত্রীর উপযুক্ত নয়, মৃন্ময়ী?

ঘুমজড়ানো কণ্ঠে মৃন্ময়ী কহিল, কথা ব'লো না, চুপ ক'রে থাকো।

বলিলাম, এত বড় একটা অবৈধ ব্যাপার ঘটবে মা-গঙ্গার বুকের ওপর, আর আমি কথা বলবো না?

অবৈধ কোথায় হোলো? মৃন্ময়ী বিস্ময় প্রকাশ করিল।

বিবাহের দ্বারা যে-ভালবাসা সিদ্ধ নয়, তাই ত' অবৈধ।

মৃন্ময়ী সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল। একরূপ চাপা অস্বাভাবিক কণ্ঠে কহিল, মনে থাকে না!

আমি উত্তর দিলাম না, কিন্তু সে পুনরায় কহিল, তুমি কাছে না থাকলে শক্তি আর স্বাতন্ত্র্য থাকে; তোমাকে দেখলে দুর্বল হই, মনটা আশ্রয় চাইতে থাকে।—তাহার চোখ দুইটি ঝাপসা হইয়া আসিল।

বলিলাম, মৃন্ময়ী, তুমি জানো, তুমি একান্ত একা?

জানি।

তোমার দুর্দিনে, দুর্ভাগ্যে, তোমার জনসাধারণের সেবার কাজে তোমার পাশে আপন জন কেউ নেই, এ কথাও কি জানো?

তাহার চোখে অশ্রুর ফোঁটা জমিয়া উঠিল। কহিল, জানি। তুমিও কি থাকবে না?

বলিলাম, কেন থাকবো? না দিলে তুমি অধিকার,

না পেলাম শাস্ত্রের সম্মতি। কোন্ দাবী নিয়ে তোমার পাশে আমি দাঁড়াবো ?

মৃন্ময়ী কহিল, যদি অবৈধই হয় তুমি কি সহ্য করবে না ? তুমি ত' অনেক অন্যায় করেছ জীবনে।

উত্তেজিত হইয়া বলিলাম, অন্যায় আমি অনেক করেছি কিন্তু তোমার এই অন্ধতা কেন ? যা নীতি-বিরোধী, শাস্ত্র-বিরোধী, সমাজ-বিরোধী তার ওপর তোমার এত মমতা কেন, মৃন্ময়ী ?

মৃন্ময়ী সোজা হইয়া বসিল। কহিল, আমি যে স্বাধীনতা চাই—কঠিন নিষ্ঠুর স্বাধীনতা। কৈফিয়ত দেবার, পেছন দিকে চাইবার, মোহগ্রস্ত হবার, সংসারের দিকে আকর্ষণ করবার—মানুষ যেন কোথাও না থাকে। কাজের মধ্যে, ওদের দুঃখের মধ্যে তলিয়ে থাকতে চাই সারা দিনরাত—সমস্তক্ষণ, সমস্ত জীবন। কেবল ক্লান্তি আর কান্নার দিনে যেন তোমায় খুঁজে পাই, যেন তোমার পায়ে মাথা রেখে আমি কোনো কোনো সময় নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারি।

অভিমান করিয়া কহিলাম, কিন্তু আমাকে তখন কেন, মৃন্ময়ী ?

তোমাকেই তখন দরকার, তুমি আমার নতুন সৃষ্টি। তোমাকে নতুন জীবনের ছাঁচে ঢেলেছি সেই আমার গৌরব। সব কাজের শেষে যেন তোমারই কাছে আশ্রয় পাই।

বলিলাম, এতে কি তুমি শান্তি পাবে ?

মৃন্ময়ী কহিল, হয়ত পাবো না, তবু জানাতে পারবো ভগবানের কাছে যে, সুখের নেশা আমি ত্যাগ করেছি। আমার ভাইবোনেরা, আমার সন্তানরা—তারা যেন জানতে পারে আমি তাদের ছাড়া আর কারো নই, আমার দুই হাত যেন চিরদিন তাদেরই সেবার জন্য মুক্ত থাকতে পারে। আমাকে কি তুমি স্বধর্ম ত্যাগ করতে বলো ?

কিন্তু অনেকদিন হইতে যাহা বলিব ভাবিতেছিলাম তাহাই এইবার আমি প্রকাশ করিয়া ফেলিলাম। বলিলাম, মৃন্ময়ী, তুমি স্বাধীন, তুমি সর্ববাধাহীন—তোমার কোনো কাজে, কোনো চিন্তায়, কোনো আদর্শে আমি কখনো বাধা দেবো না, আপত্তি তুলবো না,—কিন্তু আমাকে আজ নিশ্চিন্ত হয়ে তোমার কাজের মাঝখানে ঝাঁপ দিতে দাও। আমি তোমাকে বিয়ে করবো, মীনু।

বিয়ে !—মৃন্ময়ী কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। আমার একখানা হাত সে তখনও ধরিয়া ছিল, কিন্তু সেই হাত তাহার শিথিল হইয়া আসিল। একসময় কহিল, না সে সম্ভব নয়, তুমি দুঃখ ক'রো না।

হয়ত আমার তেজস্বিনী জননীর কথা সে ভাবিল, হয়ত ভাবিল আমাদের পরিবারের সামাজিক প্রতিষ্ঠার কথা, হয়ত

ভাবিল আমার অপেক্ষা জাতিতে সে ছোট। কী যে সে সহসা ভাবিল, বুঝিলাম না। আমি ব্যাকুল হইয়া কহিলাম, কেন সম্ভব নয় বললে না ত'?

সে সহজকণ্ঠে কহিল, তুমি টাকার মানুষ, তুমি অগাধ সম্পত্তির মালিক। নিশ্চিন্ত আরাম, পরম সুখ, অবাধ ভোগ আর বিলাস, অতুল ঐশ্বর্য—এদের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালে অপমানে যে আমার মাথা হেঁট হয়ে যাবে? দরিদ্র দুর্ভাগা সন্তানদল আর সর্বত্যাগী ভাইবোনদের আদর্শবাদের ভয়ে আমি ছুটে পালাবো সুখের গুহাগহ্বরে? ভগবান কি আমাকে ক্ষমা করবেন? এই পাপে কি তোমার কল্যাণ হবে?

কিন্তু যদি সবাই তোমার সঙ্গে থাকে?

কেমন ক'রে?

বলিলাম, আমার জীবন-মরণ যার হাতে দিলুম সে আমার সামান্য সম্পত্তির বিলি-ব্যবস্থা করবে না?

মৃন্ময়ী আমার মুখের দিকে চাহিল, কহিল, আমাকে সব তুমি দান করবে?

দান কোথায়, মৃন্ময়ী? তোমারই ত সব।

সে উত্তর দিল না, অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। স্টীমার হাঁসফাঁস করিয়া তরঙ্গ কাটিতে কাটিতে উত্তর দিকে চলিয়াছে। পথ আর বাকি নাই। নিঃশ্বাস ফেলিয়া এক সময় মৃন্ময়ী

কহিল, ওই দরিদ্র পল্লীর মাঝখানে গিয়ে সামান্য শিক্ষকের জীবন যাপন করা, পরিশ্রমের দ্বারা অর্জন করা অন্নে দিন চালানো—পারবে তুমি? দুর্যোগে, দারিদ্র্যে, অবজ্ঞায় ক্ষুদ্র হয়ে থাকা,—বলো, পারবে তুমি?

কম্পিত কণ্ঠে কহিলাম, তুমি আমাকে আজো চিনতে পারোনি, তার চেয়েও বড় কাজ আমি পারবো।

মৃন্ময়ী কহিল, তুমি ত' মেয়েদের কোনোদিন সম্মান দাওনি, আমার মান তুমি রাখবে কেমন ক'রে?

আমাকে তুমি নতুন জীবনের ছাঁচে ঢেলেছ, এখন ত' আর ও-প্রশ্ন ওঠে না?

কিন্তু যদি আমার এই রূপটুকু নষ্ট হয় কোনো কঠিন অসুখে?

বলিলাম, ক্ষতি মনে করবো না, কারণ চোখ দিয়ে তোমাকে পাইনি মৃন্ময়ী, পেয়েছি মন দিয়ে। রূপের সন্ধান আমাকে অনেকেই দিয়েছে, বড় আদর্শের সন্ধান কেবল তোমারই কাছে পেলুম। এই গঙ্গার বুকের ওপর ব'সে বলছি,—পবিত্র জন্মভূমির শপথ নিয়ে তোমাকে জানাচ্ছি, আমার সব কিছু ছিনিয়ে নিয়ে আমাকে পথের ভিখিরী ক'রে দাও তুমি—সেই হবে আমার সকল অহঙ্কার আর আত্মাভিমান থেকে মুক্তি।

নিজের চোখে জল আসিয়াছে অনুভব করিলাম, মৃন্ময়ীর

গাল বাহিয়া অশ্রু ঝরিতেছে দেখিলাম। সে আমার শেষ কথা শুনিয়া হেঁট হইয়া আমার পায়ের ধূলা লইল। কহিল, এতদিনে জানলুম কী আমি চেয়েছিলুম—এর চেয়ে বেশি কিছু নয়, এর চেয়ে বড় কিছু নয়। আজ নিঃসঙ্কোচে তোমার হাতে আত্মসমর্পণ করলুম। তুমি আমার স্বামী।

উপরে কালবৈশাখীর আকাশ ঘন হইয়া উঠিয়াছে। চাঁদপাল ঘাটে আসিয়া স্টীমার ধরিল। আমরা পৃথিবীকে ভুলিয়াছিলাম, আজ যেন নূতন জগতে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলাম। দূর হইতে নূতন এক জীবন যেন আমাদের হাত বাড়াইয়া ডাকিল। দুইজনে নির্ভয় হাসিমুখে হাত ধরাধরি করিয়া সেই দিকে চলিলাম। দেখিতে দেখিতে আকাশ ডাকিয়া বৃষ্টি নামিল।